মঞ্চে ও নেপথ্যে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ষ্টার থিয়েটার

কলিকাতা



শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ১৯৪৫

—প্রকাশক—

শ্রীরত্নেশ্বর মজুমদার

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্।

—মুদ্রাকর—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস

ফাইন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৪৩এ, নিমতলা ষ্ট্রীট্।

—ব্লক্ মেকার্স—

মেসার্স দাস ব্রাদার্স

১৪, গরানহাটা ষ্ট্রীট্।

ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ

১এ, টেগোর ক্যাসেল ষ্ট্রীট্।

—প্রচ্ছদ-পট শিল্পী—

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১।১ই, তেলিপাড়া লেন।

দাম তিন টাকা

"থিয়েটারের ষ্টেজের একেবারে ওপরে গোটা ষ্টেজ্ জোড়া এক বিরাট ট্যাঙ্ক বসিয়ে দেওয়া হবে। তাতে অসংখ্য ছিদ্র থাকবে। ওপর থেকে পাম্পিং মেশিনে করে জল আসবে সেই ট্যাঙ্কে; অসংখ্য ছিদ্রপথে সেই জল অনবরত ঝর্ ঝর্ করে বৃষ্টির আকারে নীচে পড়বে। প্লাটফর্মের এক ধার ঢালু থাকবে; জল সেই দিকে গড়িয়ে যাবে। আর, প্লাটফর্ম্ম জিনিষটা দেখতে কেমন বিশ্রী! ঘাসের চাবড়া দিয়ে ঢেকে দিলে অনেকটা মাঠের মত স্বাভাবিক দেখাবে। এই ভাবে গাঁয়ের মাঠে বৃষ্টির দৃশ্য দেখান চলবে।"···এগুলি কোন সুদক্ষ দৃশ্য-শিল্পীর নির্দ্দেশ নয়; যখন ইস্কুলে পড়তুম···এই ধরণের কত না আজগুবি, উদ্ভট পরিকল্পনা, মাথায় আসতো! বসে বসে ভাবতুম—থিয়েটারের সিন আঁকা, অভিনয় করা—এ সব ভাল করে শিখতে হ'লে কোন বইএর সাহায্য পাওয়া যায় না কি? মফঃস্বল ইস্কুলের ছেলে,—খানিকটা ভয়ে খানিকটা সঙ্কোচের সঙ্গে, খানকতক পোষ্ট-কার্ড ছাড়লুম—কলকাতার কয়েকজন বড় অভিনেতার নামে। (তখন পর্য্যন্ত তাঁদের নাম-ই শুনেছি,—চোখে দেখিনি কাউকে।) জবাব পাব আশা করিনি; কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন জবাব এল—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর নিকট হতে। আমার কিশোর জীবনের স্বপ্ন যেন বাস্তব জীবনে সার্থক হয়—তিনি আমায় সেই শুভেচ্ছা পাঠালেন; আর সেই সঙ্গে কতকগুলি বইএর নাম উল্লেখ করলেন। বইগুলি সবই ইংরাজী; বাংলা ভাষায় রঙ্গালয় সম্পর্কিত শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "নাচঘর" পত্রিকার সন্ধান পেলুম। নাচঘরের গ্রাহক হলুম; তারই মারফতে বাংলা রঙ্গালয় সম্বন্ধে যতটুকু পারি, খবর সংগ্রহ করতে লাগলুম। মনে পড়ে, তার কিছুদিন বাদে—আমার জীবনে সেই প্রথম—কলকাতার কোনো প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখবার সুযোগ হ'ল। অভিনয় দেখে এসে নাচঘরে এক প্রবন্ধ

লিখেছিলুম: "নারদ মুনি পরেছেন পাতলা সিল্কের গেরুয়া; তার ভেতর থেকে কামিজ দেখা যাচ্ছে!··· হস্তিনা নগরের রাজপুরাঙ্গনাদের গানের সঙ্গে পিয়ানো অর্গ্যান বাজছে!···সে যুগে কি অম্নি করে পিয়ানো অর্গ্যান বাজতো? কর্তৃপক্ষ কি দিশি বাদ্য যন্ত্রের প্রচলন করতে পারেন না? এই কি আমাদের রাজধানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়ের নাটকাভিনয়?"···তারপর প্রায় বিশ বছর অতীত হয়েছে; কিন্তু এমনি বিচিত্র—আজ আমি নিজে কলকাতার প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত থেকেও নারদ মুনিকে সেই বিশবছর আগে-কার সিল্কের গেরুয়া ছাড়াতে পারি নি! আজও হস্তিনার পুর-বধুরা ঠিক তেমনি করে পিয়ানো অর্গ্যানের সঙ্গে গান করেন!

মনে হয়—এই বিশবছরে রঙ্গালয়কে দেখ্‌লুম যেন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত কেবলই দোলা খাচ্ছে! যতটা সামনে এগুচ্ছে—আবার ঠিক সেই পরিমাণ পিছিয়ে যাচ্ছে! এই দেখলুম—Revolving stage হ'ল, Wagon stage হ'ল,...নূতন ধরণের আলোকসম্পাত চোখ ঝল্‌সে দিল,...Black and Whiteএর Scene, Drapery work—অগ্রগতির কত না আশ্বাস দিল!—তারপরই আবার দেখলুম, রঙ-চটা ছেঁড়া Sceneএ "মোগল পাঠান," "বঙ্গে বর্গী"র অতি ক্লান্ত পদে মঞ্চ পরিক্রমা···। আমাদের টেম্পারেচার যখন ১০৫° ডিগ্রী উঠে যায়—জ্বরের ঘোরে তখন আমরা হাত পা ছুঁড়ে প্রলাপ বকি—"সংস্কার কর্চ্ছি···মঞ্চের উন্নতি কর্চ্ছি"; টেম্পারেচার পড়ে গেলেই—দারুণ অবসাদ, অপরিসীম ক্লান্তি! সীনের গাদা থেকে বেরিয়ে আসে তখন সেই ছেঁড়া সীন··· সিন্দুক থেকে নামাই পাতা-ছেঁড়া পুরাণো বই! সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে আমরা রঙ্গালয়ের সেবা করতে পাচ্ছি না। বদ্ধ ঘরে বাইরের আলো-হাওয়া আসছে না; যে টুকু আসছে, তাও এখানকার আবহাওয়ায় মিশে তার জীবনী-শক্তি হারিয়ে ফেলছে।

রঙ্গালয়ের বিভিন্ন শিল্পকলা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কোন বাংলা বই বিশবছর আগে আমি খুঁজে পাইনি এবং আজ পর্য্যন্ত সে ধরণের বইএর একান্ত অভাব রয়েছে জেনেই আমি এ কাজে হাত দিয়েছি। কর্ম্ম-ব্যস্ততার মধ্যে বক্তব্য বিষয়গুলি হয়তো সুশোভন ভাবে প্রকাশ করতে পারিনি। ভুল, ত্রুটি থাকাও খুব স্বাভাবিক। পুণর্মুদ্রণ হলে, তখন সেগুলি সংশোধন করবার চেষ্টা করব। "আমাদের মঞ্চ" পরিচ্ছেদের অনেকগুলি প্রবন্ধ পূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি এক সঙ্গে গ্রথিত করবার সময় আবশ্যক মত পরি-বর্ত্তন পরিবর্জ্জন করে নেবার অবকাশ পাইনি; তাই হয়তো দু' একটী প্রবন্ধের স্থানে স্থানে একই বিষয়ের অবতারণা আছে। পরে এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করব। বিশ্ব-ভারতীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট থেকে —"বিসর্জ্জন" নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং "ডাকঘর" নাটকের একটী দৃশ্যের ছবি ব্যবহারের অনুমতি আদায় করে দিয়েছেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত অনাদি দস্তিদার। আর সব ছবির জন্য All India Radioর শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, এম-পির শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ, কালিকা থিয়েটারের শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ, নাট্যকার মন্মথ রায়, রূপমঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় এবং রঙমহলের বিজয় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ বইএর প্রথম পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" স্থলে "বঙ্গীয় রঙ্গশালার ইতিহাস" ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমি সত্যই লজ্জিত। ইতি

স্টার থিয়েটার, কলিকাতা।

১৯৪৫

মহেন্দ্র গুপ্ত

মঞ্চ ও শিল্পীর চির-শুভানুধ্যায়ী

ডক্টর স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মঞ্চে ও নেপথ্যে

সূচিপত্র



"বিসর্জ্জন" নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ



রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" নাটকের একটী দৃশ্য

গোড়ার কথা

কালিদাস, ভবভূতি ভারতীয় নাট-মঞ্চের জন্যে নাটক তৈরী করে ছিলেন। সে যুগের অনুপম নাট-মঞ্চের স্মৃতি এখনও রামগড় পাহাড়ের গায়ে বিদ্যমান। কালিদাস, ভবভূতির অমর নাট্যকলা আজও জগতের কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু হয়ে রয়েছে। আমাদের অতীত সমৃদ্ধির কথা ভাবতে আমরা আনন্দ পাই, গর্ব্ব অনুভব করি; কিন্তু তা বলে একথা ভুললে চলবে না যে আমাদের নাট-মঞ্চ বা নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে কালিদাস ভবভূতির যুগের কোনও সম্পর্ক নেই। মুসলমান যুগে কেমন করে নাট্যকলা অনাদৃত ও প্রায় অবলুপ্ত হ'ল,···ইংরেজ আমলে ইংরেজী নাটকের অনুকরণে আবার কেমন করে এদেশে ধীরে ধীরে নাট্য-সাধনার আরম্ভ হ'ল—সে সব কথার বিস্তৃত আলোচনা করবেন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। যাঁরা এ সব ঐতিহাসিক তথ্য জানতে চান—তাঁদের জন্যে সাহিত্য-পরিষদের প্রামাণিক গ্রন্থ "বঙ্গীয় রঙ্গশালার ইতিহাস" আছে, এবং ডাক্তার হেমেন্দ্র দাস গুপ্তের "ভারতীয় নাট্যমঞ্চ" প্রকাশিত হয়েছে।

আজকের দিনের ভারতীয় নাটমঞ্চ বলতে আমরা বুঝি বাংলার নাটমঞ্চ; কারণ—সিনেমা প্লাবিত ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে প্রকাশ্য রঙ্গালয় আছে বলে আমাদের জানা নেই। যদি বা আর কোন প্রদেশে কদাচিৎ নাট্যাভিনয় হয়, একথা সত্য, বাঙ্গালীর মত নাট্যকলাকে জীবনের উপজীব্য হিসাবে আর কোন প্রদেশবাসী আজও গ্রহণ করতে পারেনি। তাই বলছিলুম, এ যুগের ভারতীয় নাটমঞ্চ বল্‌তে—আমরা বুঝি···বাংলার নাটমঞ্চ, বাঙ্গালীর নাটমঞ্চ।

মঞ্চ-লোকের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁদের প্রত্যেককেই বলা চলে—মঞ্চের শিল্পী। এইসব শিল্পীদের মধ্যে অনেকে প্রত্যক্ষভাবে মঞ্চে অবতরণ করেন—এবং অনেকে মঞ্চের নেপথ্যে থেকে মঞ্চাভিনয়ে সাহায্য

করেন। নাট্যকার, নাট্যপরিচালক, নট-নটী, সুরস্রষ্টা, আলোক-সম্পাতকারী, মঞ্চ-সজ্জাকর, রূপ-সজ্জাকর প্রভৃতি প্রত্যেকেই মঞ্চের শিল্পী। এক কথায়, যে সব শিল্পীর সমবেত প্রচেষ্টায় মঞ্চের অভিনয় সম্পূর্ণ হয়—অর্থাৎ দর্শকগণ যাঁদের সমবেত সাধনায় পরিপূর্ণভাবে নাট্যরস আস্বাদন করতে পারেন—তাঁরাই মঞ্চের শিল্পী।

এই সব শিল্পীর বিষয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা অনেক হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। সে আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। নাটমঞ্চ হতে রসলিপ্সু দর্শককে নাট্যরস পরিবেশন করতে হলে—শিল্পীর কোন্ কোন্ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন—এবং আমাদের বর্ত্তমান নাটমঞ্চের গতি কোন দিকে—সংক্ষেপে সে বিষয়ে আলোচনা করব।

একটী কথা, বিলাতী থিয়েটারের অনুকরণে আমাদের নাটমঞ্চের নূতন করে ভিত্তি পত্তন হয়েছিল—সে প্রায় দেড় শ' বছর আগে। এই দেড় শ' বছরে—আমাদের নাটমঞ্চে বিলাতী গন্ধ যে খুব বেশী লোপ পেয়েছে তেমন কিন্তু মনে হয় না। ভাবের দিক দিয়ে হয়তো খানিকটা স্বদেশী জিনিষ আমদানী হয়েছে—কিন্তু আমাদের নাটমঞ্চের বহিরাবরণ এখনও সম্পূর্ণভাবে বিদেশী। অভিনয় দেখে গিয়ে—এক বন্ধু আমায় এক চিঠি দিয়েছিলেন ; তার খানিকটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করলুম।

"......থিয়েটারের (Theatre) বুকিং অফিসে (Booking Office)এ ভয়ানক রাশ্ (Rush)! যাহোক ফার্ষ্ট রো (First Row)তে টিকিট (Ticket) মিলল। অডিটোরিয়ম (Auditorium) তখনও খোলেনি ; গার্ড (Guard) লবিতে (Lobby) বসতে বলল। আমি বল্লুম ; আপনাদের হিরো আর্টিষ্টএর (Hero Artist)

…সঙ্গে দেখা করব।…তিনি আমায় গ্রীণরুমে (Green Room) ডেকে পাঠালেন।…দেখলুম—কেউ গ্রীজ্ পেণ্ট (Grease Paint) কর্চ্ছে, কেউ কেবল পাউডার (Powder) ইউজ্ (Use) কর্চ্ছে; তবে সকলেরই রুজ্ (Rouge) লিপষ্টিক (Lipstick) ও ভুরু টানবার পেন্সিল্ (Pencil) রয়েছে।…ম্যানেজার (Manager), প্রোডিউসার (Producer), মিউজিক ডিরেক্টর (Music Director) সবার সঙ্গেই আলাপ হল।…মেকঅপ (Make up) শেষ হলেই ওয়ার্ণিং বেল (Warning Bell) বাজল, ইলেক্‌ট্রিস্থান (Electrician) ফুট্‌লাইট (Foot light) খুলে দিয়ে, স্পট্ লাইট (Spot light) নিয়ে রেডি (Ready) হল, প্রম্পটার (Prompter) হুইসিল (Whistle) হাতে নিল, শিফ্‌টাররা (Shifter) স্কাই (Sky), উইংস্ (Wings) এবং ফার্ষ্ট অ্যাক্টের (First Act) ফ্ল্যাট (Flat) ও সেট্ সীন (Set Scene) ঠিক আছে কিনা দেখে…আগে এডভারটাইজমেণ্ট ড্রপ (Advertisement Drop) তুলল, পরে স্ক্রীন (Screen) তুলতে গেল।…এখন কন্‌সার্ট (Concert) বাজে না, প্লের (Play)র আগে ও ইন্‌টারভ্যালে (Interval) বাজে এম্‌প্লি-ফায়ার (Amplifier)…"

আমার বন্ধুটী এত বেশী ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে—তিনি একা দায়ী নন; যে সব কথা তিনি ব্যবহার করেছেন, এর কোনটির বাংলা প্রতিশব্দ আমাদের চলতি নাটমঞ্চের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয় না। দেড় শ' বছর আগে বাংলার মাটিতে যে নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হ'ল—তার এমন অপূর্ব্ব বৈদেশিক রূপ-সজ্জা—আনন্দের বা দুঃখের জানিনা—তবে মজার কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে—আমি আমাদের নাটমঞ্চ সম্বন্ধে যেটুকু বিচার বিশ্লেষণ করব—তা অনেকখানি বিদেশী নাটমঞ্চের আদর্শ অনুসরণে। বর্ত্তমান নাটমঞ্চের সঙ্গে কোন যোগ না রেখে যাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক নূতনতর নাটমঞ্চ সৃষ্টি করতে চান—তাঁরা শক্তিমান, তাঁদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাই। কিন্তু আমার বর্ত্তমান আলোচনা সে সব সৃষ্টিপন্থীদের জন্য নয়,—সংস্কার পন্থীদের জন্য। বর্ত্তমান নাট্য-জগতের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন—তাঁদের বিষয়ে কয়েকটী দরকারী কথা বলব; আমার আলোচনায় তাই অনেক ইংরেজী শব্দও ঠাঁই পাবে। কারণ, আগেই বলেছি, নাট্যলোকে এমন অনেক ইংরেজী কথার প্রচলন আছে, যার বাংলা প্রতিশব্দ একমাত্র অভিধানে অথবা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে, মঞ্চের শিল্পীদের দৈনন্দিন জীবনে নয়। সেই সব চলতি ইংরেজী কথা ব্যবহার না করে, অভিধান থেকে তার বাংলা প্রতি-শব্দ খুঁজে এনে ব্যবহার করলে, যাঁদের জন্যে এ আলোচনা, তাঁদের অনেকের পক্ষেই খুব সহজ-বোধ্য হবে না। সহজে বুঝতে না পারলে আমার উদ্দেশ্যও সফল হবেনা। এটা আমার সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস নয়; নাট্য-জগতের নিতান্ত ঘরোয়া গোটা কয়েক কাজের কথা বলা।

इक-तारो

নাটমঞ্চে শিল্পীর সমাবেশ হয় নাটককে রূপায়িত করবার জন্তে। নাটককে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন শিল্পীর রস-সৃষ্টির প্রয়াস। তাই প্রথমে নাটকের রচনা রীতি (Dramatic technique) সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে "The Dramatist is born, not made"; নাট্যকার তৈরী হন না···নাট্যকার জন্মান। এর ভেতর হয়তো খানিকটা সত্য আছে, কিন্তু সবটুকুই নয়। নাটক লিখতে এমন কিছুর প্রয়োজন আছে যা জন্মগত অধিকার রূপে পাওয়া যায় না,—তাকে আয়ত্ব করে নিতে হয় অনুশীলন দিয়ে। তাই গোড়াতে সব নাট্যকারকেই কিছুদিন শিক্ষানবিশী করতে হয়। শিক্ষানবিশী জীবন সবচেয়ে সহজে ও সত্বর পেরিয়ে আসতে হলে একটী উপায় আছে; সে হ'ল—নাটক রচনার মূল সূত্রগুলিকে আয়ত্ব করা। নাটক রচনার এই সব নিয়ম বা সূত্র কারুর মন-গড়া নয়; দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে এবং জন্মগত বিচিত্র প্রতিভার সাহায্যে যে সব নাট্যকার অমর নাট্য রচনা করে গেছেন—এগুলি তাঁদেরই রচনা কৌশল থেকে সঙ্কলিত।

নাটক রচনার সূত্রগুলিকে তিনটী পর্য্যায়ে ভাগ করা চলে; (১) সার্ব্বজনীন, (২) যুগধর্ম্মী এবং (৩) ব্যক্তিগত; (Universal, Special and Individual); নাটক রচনার এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে যা সবদেশের এবং সবকালের নাটকের ভেতর মোটামুটি ভাবে পাওয়া যায়—এই নিয়ম গুলিকে সার্ব্বজনীন সূত্র বলা যায়। যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারা, মানুষের কৃষ্টি—সব কিছুরই পরিবর্ত্তন আসে। তাই যুগে যুগে নাটকের গঠন পদ্ধতিতেও পরি-

বর্ত্তন আসা অবশ্যম্ভাবী। একশ’ বছর আগে যে দর্শকদের সামনে অথবা যে ধরণের নাটমঞ্চে কোন একটী নাট্য-কাহিনী রূপায়িত হয়েছিল—শতবর্ষ পরে ঠিক সেই নাট্য-কাহিনীটিকেই নাটমঞ্চে রূপদান করতে হলে—সবার আগে এই কথাটী মনে রাখতে হবে যে...আজকের নাটমঞ্চ এবং আজকের দর্শক পূর্ব্বযুগ হতে বহু বিষয়ে স্বতন্ত্র। তাই নাটকের রচনারীতিকেও যুগানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করে নিতে হবে। নাটক রচনার তৃতীয় সূত্রটীকে বলা হয়েছে—ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত রচনা কৌশলকে অনুকরণ করা চলে না। জগতের যাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর নাট্যকার, তাঁরা অনেক সময় নাটকের সাধারণ রচনা রীতির সঙ্গে এমন এক একটী রচনা কৌশল সংযুক্ত করেন—যাকে বলা যায় সম্পূর্ণ ভাবে তাঁদের নিজস্ব রচনা-ভঙ্গী। অন্যের স্যুট্ ধার করে এনে পরলে যেমন বেমানান দেখায়—সেই ব্যক্তিগত রচনা রীতিকে আয়ত্ত্বে এনে নাটক রচনার প্রচেষ্টাও তেমনি হাস্যকর হয়ে পড়ে। নাটক রচনা করতে হলে, আগে দরকার সাধারণ বা সার্ব্বজনীন সূত্রগুলি বুঝে নেওয়া; তারপর সমসাময়িক নাটমঞ্চ ও দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী রচনারীতির সংস্কার সাধন করা; এবং তৃতীয়তঃ কারুর ব্যক্তিগত রচনারীতির অনুকরণ না করে নিজস্ব রচনা কৌশল প্রয়োগ করা।

নাটক ও কথা সাহিত্য

নাটকের যে একটা আলাদা গঠন পদ্ধতি আছে তা খুব সহজে বোঝা যায়···নাট্যকার আর কথাশিল্পী—এই উভয়কে তুলনা করে দেখলে। এঁদের উভয়ের কারবার একই ধরণের মালমশলা নিয়ে; দু'জনেরই চাই গল্প, চরিত্র সৃষ্টি এবং কথা বা dialogue; অথচ এমনি মজা, যে কোন ভাল গল্প বা উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করলে তা দর্শককে রস পরিবেশন করতে পারবে—তার কোন মানে নেই। যে গল্প পড়ে তৃপ্তি পেয়েছি—তার নাট্যরূপ দেখে তৃপ্তি পেলুম না—এর কারণ কি?

কথা-সাহিত্যিক তাঁর কাহিনী বর্ণনা করতে প্রচুর সময় পান, নিজের ইচ্ছামত তিনি পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ বর্ণনা করে যেতে পারেন। কিন্তু নাট্যকারকে এমন ভাবে কাহিনীটীকে সংক্ষিপ্ত-ভাবে সাজাতে হবে, যেন দুই বা তিন ঘণ্টার মধ্যে সেই নাট্য-কথার অভিনয় সম্পূর্ণ হয়। অবকাশ মত বার বার পড়ে এক-খানি উপন্যাস শেষ করা যায়; কিন্তু দর্শকেরা নাটক উপভোগ করবেন—ঐ দুই ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টা কাল বসে থেকে, একবারে। কথা-সাহিত্যিক তাঁর কাহিনী বুঝতে নিজে আমাদের সাহায্য করেন। কেন তাঁর কাহিনীর চরিত্রগুলি কোন বিশেষ গতিপথ বেছে নিচ্ছে··· ঔপন্যাসিক নিজের ভাষায় তা পাঠককে বার বার বুঝিয়ে দেবার অবকাশ পান। কিন্তু নাট্যকার তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সম্পূর্ণ আড়ালে থাকেন। চরিত্রের মুখের কথায় এবং তার কাজ দেখে—তাকে বুঝে নিতে হয়। নাট্যকার একবারও সেখানে এসে তাঁর চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে এতটুকু মন্তব্য করবার অবকাশ পান না। শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক তাঁর রচনায় সর্ব্বদা সুপ্রকাশ থাকেন এবং শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তাঁর নাটকের মধ্যে সর্ব্বদা থাকেন অপ্রকাশ।··

কথা-সাহিত্য বা উপন্যাসের রস আস্বাদন করি আমরা চোখের সাহায্যে; কিন্তু নাটক উপভোগ করি চোখ এবং কাণ—দু'য়ের সাহায্যে। মঞ্চের দৃশ্যপট, আলোক সম্পাত, সাজসজ্জা—নাটককে এমন সাহায্য করে—যার ফলে বহুপ্রকার বর্ণনা, যা নাকি উপন্যাসের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়···নাটকে তা' হয়ে দাঁড়ায় নিতান্ত অবান্তর।

উপন্যাসকে বলা যায় ঔপন্যাসিকের একক বা ব্যক্তিগত সৃষ্টি; পক্ষান্তরে নাটক হ'ল সমবেত সৃষ্টি। নাট্যকার, নট-নটী, নাট্য-পরিচালক—এঁদের সমবেত প্রচেষ্টার ফল—পূর্ণাঙ্গ নাট্য-রস-সৃষ্টি। যেহেতু নাট্যকার ব্যতীত আরও অনেক শিল্পী একখানি নাটককে সম্পূর্ণ করেন—তাই নাট্যকারকে বহু স্থলে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মুখে কেবল সামান্য আভাষ ইঙ্গিত রেখেই সরে দাঁড়াতে হয়; নটনটী এবং অন্যান্য শিল্পীরা নাট্যকারের সৃষ্ট সেই অসমাপ্ত চরিত্রকে ভাবে, ব্যঞ্জনায় সম্পূর্ণ করে তোলেন। তাই উপন্যাসে কথা বেশী, নাটকে কথা অনেক কম।

দেশের মুষ্টিমেয় সাহিত্য রসিকের নিকট থেকে সুখ্যাতি পেলেই ঔপন্যাসিক পরিতৃপ্ত; কিন্তু নাটকের কারবার দেশের শুধু সেই একটী বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীকে নিয়ে নয়—জনসাধারণকে নিয়ে। সর্ব্বজন অথবা বৃহত্তম গোষ্ঠীকে তৃপ্তি দিতে পারলে—তবেই নাটকের সার্থকতা।...উপন্যাস এবং নাটকের রচনা রীতিতে এত পার্থক্য আছে বলেই—শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সর্ব্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ মঞ্চ-নাটক হয়ে উঠতে পারেনি। নাটকের ঘটনার গতি উপন্যাসের চেয়ে হবে অনেক দ্রুত, সময় সংক্ষেপের জন্যে হবে অত্যন্ত সংহত, নাটকের প্রত্যক্ষ আবেদন থাকবে

ঢের বেশী, নাটকের মধ্যে নাট্যকার নিজে থাকবেন সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন ভাবে, নাটক বহুশিল্পীর সমবেত সৃষ্টি, এবং নাটকের আবেদন বৃহত্তম গোষ্ঠীর নিকট। সর্ব্বকালের এবং সর্ব্বদেশের নাট্যকার মোটামুটি ভাবে নাটকের এই সূত্রক'টী মেনে চলেছেন।

ক্রিয়া

সব নাট্যকারের লক্ষ্য থাকে প্রথমতঃ—দর্শকের মনযোগ যত শীঘ্র সম্ভব আকর্ষণ করা; দ্বিতীয়তঃ—দর্শকের কৌতূহল শেষ যবনিকা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বাড়িয়ে তোলা। দর্শকের মনকে ধরে রাখা যায়—নাটকের ক্রিয়া, চরিত্র সৃষ্টি এবং কথার সাহায্যে। আজকাল অনেক সময় প্রশ্ন ওঠে, নাটকীয় ক্রিয়া বা Action, চরিত্র সৃষ্টি বা Characterisation এবং কথা বা Dialogueএর ভেতর কোনটী দর্শকের মনোহরণ করবার পক্ষে বেশী মূল্যবান। নাটকের একেবারে গোড়ার যুগে ক্রিয়া বা Action সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য পেত; তারপর Action এর সঙ্গে যুক্ত হ'ল চরিত্র সৃষ্টি। নাটকে Dialogue বা কথার কদর হল আরও পরবর্ত্তী যুগে। সব যুগের সব শ্রেণীর দর্শক ক্রিয়া বা Action বহুল নাটককেই বেশী পছন্দ করে এসেছে। নাটকের ক্রিয়াকে বুঝতে সাহায্য করে, তাই চরিত্র ও নাটকের কথাকেও তারা আমল দিয়েছে। ক্রিয়া বহুল নাটক এত জনপ্রিয় হয়েছে বলে তাকে মেলোড্রামা (Melo Drama) নামক একটী বিশেষ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মেলোড্রামা নামক এই বিশেষ শ্রেণীর নাটক···যেখানে ক্রিয়াই মুখ্য এবং চরিত্র সৃষ্টি বা কথা নিতান্ত গৌণ···সর্ব্বশ্রেণীর দর্শককে সব চেয়ে বেশী আনন্দ দেয়।

নাটকে ক্রিয়ার এত প্রাধান্যের কারণ কি? নাটকের কাজ হ'ল—দর্শক মনে বিভিন্ন ভাবধারার উদ্রেক করা। মানুষের মনে অতি দ্রুত নানাবিধ ভাবতরঙ্গ তুলতে পারে কে? ভাবুক অথবা কর্ম্মী?...আমরা যা ভাবি বা বলি, সব সময় তা কাজে করিনা; যেটা করি তাই দেখে লোকে আমাদের বিচার করে। স্বদেশ সেবার বড় বড় বুলি আওড়ালুম; কিন্তু দেশের ঠিক সঙ্কট-মুহূর্ত্তে দেশ সেবা ছেড়ে দার্জ্জিলিংএ হাওয়া খেতে গেলুম—তাহলে আর আমাকে কেউ স্বদেশভক্ত

বলবে না। তাই ইংরাজীতে একটা কথা আছে; "Actions are louder than words" কাজ কথার চেয়েও জোরে কথা বলে। নাটকে এই জন্যে দর্শকমন action বা ক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অভিভূত হয়। তবে এ কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে...শুধু ক্রিয়া বহুল নাটক মেলোড্রামা বা হাস্যরসাত্মক নাটকরূপে গড়ে ওঠে; উচ্চ-শ্রেণীর নাটকে ক্রিয়ার বিশ্লেষণের জন্যে প্রয়োজন, চরিত্র সৃষ্টি বা characterisation.

•

শ্রেষ্ঠ নাট্যকারেরা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখেন যে, নাটকে বহির্মুখী ক্রিয়া থাকাটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়, বড় কথা হল—দর্শকের মনে বিভিন্ন ভাবধারার সঞ্চার করা। এই ভাবধারার দ্রুত উদ্রেক সাধন করা যায়...ক্রিয়া, চরিত্রসৃষ্টি ও কথার সাহায্যে। যে নাটকে বহির্মুখী ক্রিয়ার অভাব এবং চরিত্র সৃষ্টি ও কথাই বলবান—তাও অনেক সময় দর্শককে খুসী করে। তার কারণ, চরিত্র ও কথার অন্তরালে সেখানে লুপ্তধারা ফল্গুরমত, ক্রিয়া বরাবর অলক্ষ্যে থেকে দর্শকের মনে ভাব-ধারার উদ্রেক করে।

নাটকের উপাদান

নাটকের মূল কাহিনী বা প্লট (plot) তৈরী করবার মালমসলা অনেক রকমে যোগাড় করা যায়। নাটক রচনার চিন্তা লেখকের মনে আসতে পারে কোন একটী ঘটনা, ভাব, কথা, দৃশ্য বা যে কোনো কাল্পনিক বস্তুকে অবলম্বন করে। তবে যাঁরা কোন একটী কাহিনীকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা আরম্ভ করেন—তাঁদের কাজ হয় খুব সহজ-সাধ্য; কারণ নাটক রচনার মূলপ্রেরণা যে দিক থেকেই আসুক না কেন—নাটকে একটী গল্প থাকা একেবারে অপরিহার্য্য। সাধারণ গল্প ও নাটকের মূল কাহিনীর মধ্যে তফাৎ আছে। সাধারণ গল্পকে নাটক রচনার অনুশাসন অনুযায়ী সংস্কার করে নিলে তবে তা থেকে তৈরী হয় নাট্য-কাহিনী।

নূতন নাট্যকারেরা অনেক সময় অভিনবত্বের (Novelty) মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন না। তাই তাঁরা নাটকের মালমসলা জোগাড় করতে চান নিছক কল্পনা বা হাওয়া থেকে। তাঁরা এই কথাটী ভুলে যান যে, পৃথিবীর মাটিতে রসপুষ্ট সহস্র নাটকীয় উপাদান ছড়িয়ে আছে। তা থেকে প্রয়োজন মত বেছে নিলে নাটকের অভিনবত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না; বরং সেইগুলিই হল নাটকের প্রকৃত উপাদান এবং সর্ব্বকালের নাট্যবিদ্ কেবলমাত্র তাদেরই গ্রহণ ক'রে নাটক রচনা ক'রে কীর্ত্তিমান হয়েছেন। মাতৃস্নেহ, বাৎসল্য, দাম্পত্য-প্রেম, উচ্চাশা প্রভৃতি পৃথিবীর আদিম এবং আধুনিকতম মানুষের মনের ভেতর বাসা বেঁধে আছে। এগুলি নিয়েই সেকালেও নাটক রচিত হয়েছে—এবং আজকের দিনেও হচ্ছে। তফাৎ, কেবল ঘটনা সন্নিবেশ নৈপুণ্যের বা নাটকীয় গঠন কৌশলের। একশ' বছর আগে যুদ্ধে বীরত্ব দেখান যে ধরণের ছিল—আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে রণ-কৌশল তার চেয়ে ঢের পরিবর্ত্তিত হয়েছে। বীরত্ব নিয়ে

যুগে যুগে নাটক রচনা চলতে পারে; সে নাটক যুগে যুগে দর্শক-মনকে আলোড়িত করতে পারে—যদি তার গঠন পদ্ধতি হয় অভিনব বা যুগধর্ম্মী।

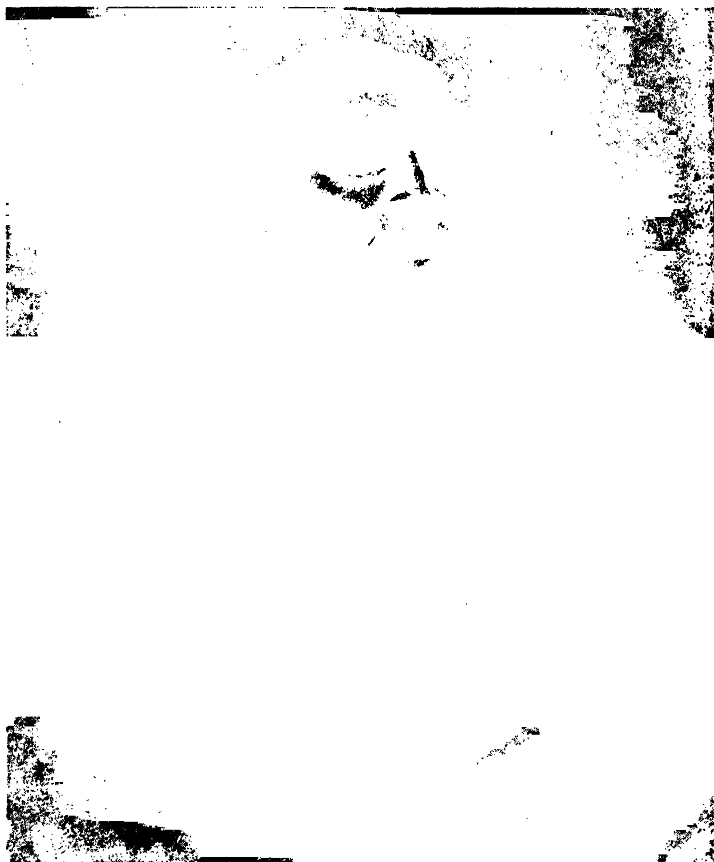
যা সত্য ঘটনা বা Fact, তাই যে সব সময় নাটকের উপাদান হবে একথার কোন মানে নেই। যা মিথ্যা বা নিছক কল্পনা তাকেও যদি এমন নাটকীয় কৌশলে সাজিয়ে তোলা যায় যে···অভিনয়কালে দর্শকের তাকে সত্য বা বাস্তব বলে মনে হবে—তা হলে সেই মিথ্যা বা কল্পনাও নাটকের উপাদান হতে পারে। নাটক হল—art of make believe; যে কোনো ভাব, কাহিনী বা কথাকে দর্শক সত্য বলে মেনে নিলেই—তা হবে নাটকীয়। "আমি একে সত্য বলে জানি"—নাট্যকারের একথা বলবার অধিকার নেই; নাট্যকার দেখবেন—তিনি যে ভাবে তাকে দর্শকের সামনে তুলে ধর্চ্ছেন—তাতে করে দর্শক তাকে অসঙ্কোচে সত্য বলে মেনে নিচ্ছে কিনা।

সুস্পষ্ট অনুভূতি

নাটক রচনার সময় নাটকের বিষয়-বস্তু এবং ঘটনা সংস্থাপনের স্তর-গুলি সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট অনুভূতি থাকা প্রয়োজন। নূতন নাট্য-কারেরা অনেক সময় নাটক রচনাতেই বেশী সময় অতিবাহিত করেন, রচনার পূর্ব্বে যথাযথ উপাদান সংগ্রহ ও তাকে সুন্দর রূপে সাজিয়ে নেবার ধৈর্য্য তাঁদের থাকেনা। তাই অনেক সময় নাটককে খুব ভাল Starting দিয়েও তাঁরা শেষ রক্ষা করতে পারেন না। মাঝপথে এসেই খেই হারিয়ে ফেলেন। কাগজ কলমে রচনাকার্য্য আরম্ভ করবার আগে বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অনুভূতির প্রয়োজন এই জন্য যে,—গোড়ায় যে চরিত্র বা যে ঘটনাটী নাট্যকারের মনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বোধ হয়—কাহিনীটী খানিকদূর অগ্রসর হবার পর এমনও দেখা যেতে পারে যে, সেই বিশেষ ঘটনা বা চরিত্র নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং নাটক রচনা আরম্ভ করবার পূর্ব্বে সেই অনাবশ্যক ঘটনা বা চরিত্রটীকে বাদ দিয়ে যে ঘটনা ও চরিত্রপুঞ্জ শেষ পর্য্যন্ত নাট্যকারের প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তাদের নিয়েই মূল কাহিনী গড়ে তুলতে হবে।

নাট্যকার কোন্ চরিত্রের প্রতি দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চান—এ বিষয়েও নাট্যকারের সচেতন থাকা দরকার। নইলে দর্শকেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং তার ফলে নাট্যরস সৃষ্টি ব্যহত হয়। মোট কথা—নাটক রচনার পূর্ব্বে—নাট্যকার যেন পরিষ্কার ভাবে জবাব দিতে পারেন—কোন চরিত্র তাঁর কাহিনীর নায়ক;—তাঁর নাটকের ঘটনা-প্রবাহের গতি হবে কোন পথে।

নাটকে ক্রিয়ার ঐক্য (Unity of action) অথবা ঘটনা সমূহের এক-মুখী গতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর একদিকে নাট্যকারের দৃষ্টি



মহাকবি গিরিশচন্দ্র

রাখা প্রয়োজন—সে হ'ল শিল্পধর্ম্মী ঐক্য বা Artistic unity। যে নাটক খুব গুরুগম্ভীর আরম্ভের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে, শেষ হয় হাস্য-রসে...অথবা যে নাটক অতি হাল্কা, অতিশয় লঘু পরিবেশের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে বিয়োগান্ত পরিণতি লাভ করে—সে ধরণের নাটক সাধারণতঃ দর্শককে তৃপ্তি দিতে পারে না। নাটক হাস্যরসাত্মক হবে—অথবা বিয়োগান্ত হবে—নাটকের সূচনাতেই যেন দর্শক তার খানিকটা আভাষ পায়। তা নইলে হাস্যরস থেকে করুণরসে, কিম্বা করুণ থেকে হাস্যরসে নাট্যকার যদি তাঁর সৃষ্টিকে টেনে নিয়ে যান—নাটকের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সে দ্রুত পরিবর্ত্তন দর্শক কখনও খুসীর সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনা। যদি কোনও নাটকে নাট্যকার হাস্য-রস এবং করুণরস দুই-ই রাখতে চান—তাহলে হয় হাস্যরসকে প্রাধান্য দিয়ে করুণরসকে করতে হবে গৌণ, এবং নাটকের সমাপ্তিও করতে হবে হাস্যরসাত্মক, অথবা হাস্যরসকে করুণরসের অনুবর্ত্তী রেখে যবনিকা ফেলতে হবে করুণরসের মধ্যে।

আজকাল অনেক সময় প্রশ্ন ওঠে, নাটকে গল্পকে কতখানি প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আগের কালে নাটকের প্রধান কাহিনীর অন্তর্গত আরও দুই তিনটি মিশ্র কাহিনী স্থান পেত। আজকাল দর্শকেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চান—মাত্র একটি প্রধান কাহিনীর নাট্যরূপ।

বিভিন্নদেশের এবং বিভিন্নকালের মানুষের চাহিদাও বিভিন্ন ধরণের। যেমন, আজকের দিনেও আমেরিকা ও ইংলণ্ড...য়ুরোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে নাটকের কাহিনীকে প্রাধান্য দেয় বেশী। ফরাসী, রাশিয়ান বা জার্ম্মাণরা চরিত্র সৃষ্টি নিয়েই ব্যস্ত; নাটকে কাহিনী খুব সামান্য থাকলেই হল। এই জন্য, কোন ফরাসী নাটক ইংলণ্ডে মঞ্চস্থ

করতে হলে, তাতে খানিকটা গল্পের সংমিশ্রণ করে নেওয়া দরকার হয়ে পড়ে; নইলে ইংরেজ দর্শকেরা তার অভিনয় দেখে পূর্ণ তৃপ্তি পান না।

একথা খুবই সত্য যে, নাটকের গল্প জোরালো হলে নাটকের অন্যান্য অনেক দৈন্যও চাপা পড়ে যায়। সাধারণ দর্শকের প্রধান আকর্ষণই হ'ল গল্প। এমন কি এই বিংশ-শতাব্দীতেও Shakespeare এর Macbeth, Hamlet বা Tempest প্রভৃতি নাটক যে বিপুল দর্শক আকর্ষণ করে—তারা সবাই কাব্য ও চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা আকৃষ্ট হয় না—তাদের আকর্ষণ করে ঐ সব নাটকের গল্পাংশ।

অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ

নাটকের ঘটনাকে অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভক্ত করা হয় কেন? নাট্যকারের কাজ হ'ল দর্শক মনে বিরতি-বিহীন-কৌতূহল সৃষ্টি। সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, নাটকীয় ঘটনার মাঝখানে অঙ্ক ও দৃশ্যের বিভাগ না এনে, যদি একটানা ভাবে ঘটনাকে এগিয়ে নেওয়া যায়, তা'হলে বোধ হয় দর্শক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। দর্শক-মনের ধারণাশক্তিরও একটা সীমা আছে, বিশ্রাম না দিয়ে বহুক্ষণ দর্শকের মনকে আটকে রাখলে—দর্শক মন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। অভিনয় ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে, এক ঘণ্টার চেয়ে বড় বিরাম বিহীন একাঙ্ক নাটক (সমস্ত নাটকীয় গুণ থাকা সত্ত্বেও) দর্শককে ক্লান্ত করে ফেলেছে। দর্শককে খানিকটা বিশ্রাম দেবার জন্যে নাটকে মাঝে মাঝে বিরতি ও দৃশ্য পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন।

নাটক যত বেশী ঘটনা বহুল হবে, তাতে যত বেশী চরিত্র সৃষ্টি থাকবে··· তার অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগও সেই অনুপাতেই হবে। নাটকীয় ঘটনার স্থান এবং কাল যে নাটকে যতটা পরিবর্ত্তিত হবে—তদনুযায়ী সেই নাটক তিন, চার বা পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত হবে। তবে এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, অঙ্ক মধ্যে দৃশ্য পরির্ত্তন যত কম করা যায়—ততই ভাল। কারণ দৃশ্য পরিবর্ত্তনে যতটুকুই সময় যাক্ না কেন—তার ফলে নাট্যকার যে ইন্দ্রজাল রচনা ক'রে দর্শককে বিমুগ্ধ করতে চেষ্টা করেন—সেই ইন্দ্রজাল বা illusion খানিকটা কেটে যাবেই। অবশ্য আধুনিক কালে দৃশ্য পরিবর্ত্তন অত্যন্ত দ্রুত করবার জন্যে ও দেশে Revolving, Wagon এবং Sinking Stage [ঘূর্ণী, শকট ও ডুবরী (?) মঞ্চ] প্রবর্ত্তিত হয়েছে। আমাদের দেশেও প্রথম দুইটি, অর্থাৎ ঘূর্ণী ও শকট মঞ্চে অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু

তাহ'লেও নাট্যকারের উচিত—অঙ্কমধ্যে বিভিন্ন দৃশ্য বিভাগ যত সম্ভব কমিয়ে দিয়ে নাটকীয় ইন্দ্রজাল সৃষ্টিকে অব্যাহত রাখা। অঙ্ক মধ্যে দৃশ্য পরিবর্ত্তন না করে, প্রতি অঙ্কের বিরতি মধ্যে সম্ভব মত দৃশ্য পরিবর্ত্তন করলে নাটক দর্শককে বেশী খুসী করে। অঙ্ক বিরতির মধ্যে দৃশ্য পরিবর্ত্তন করলে, illusion নষ্ট হয় না—তাছাড়া দর্শকের চোখও নূতন দৃশ্যের অবতারণায় অনেকখানি তৃপ্তি পায়।

নাট্যকারকে ঘটনার সময় পরিবর্ত্তন নিয়ে বড়ই বেগ পেতে হয়। কথাশিল্পী তাঁর উপন্যাসের ঘটনা সম্বন্ধে বলতে পারেন—"নায়ক নায়িকা বসে গল্প কচ্ছিল। গল্প করতে করতে এক ঘণ্টা কেটে গেল।" কথাশিল্পী আধ মিনিটের কথায়...মাত্র দু'টী লাইনে...নায়ক নায়িকাকে দিয়ে এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু নাটকের নায়ক যদি আধ মিনিট কথা বলেই তারপর বলে..."এই তো এক ঘণ্টা ধরে কথা কইলুম"—তাহ'লে দর্শকেরা নায়কের সময়ের জ্ঞান দেখে হেসে উঠবে। কাজেই নাট্যকারকে এমন ভাবে ঘটনা সংস্থাপন করতে হবে—এমন ভাবে চরিত্র সৃষ্টি করে কথার জাল বুনতে হবে—যাতে করে মুগ্ধ-দর্শক-মন সময়ের ব্যবধান ভুলে যায়। এরূপ নাট্যকৌশল অত্যন্ত কঠিন। তাই অধিকাংশ নাট্যকার অঙ্ক বিভাগের বিরতির মধ্যে সময়ের পরিবর্ত্তন করিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। প্রথম অঙ্কের সামান্য পাঁচ মিনিট বিরতির পর, দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনায় যদি বলা হয় "সেই থেকে এক মাস কেটে গেছে"... তাহ'লে দর্শক সেই পাঁচ মিনিট বিরতিকেই এক মাসের ঘটনার ব্যবধান বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে না। সময়ের সমস্যা ছাড়া, নাটকীয় চরিত্রের বেশ বা রূপসজ্জা পরিবর্ত্তনের অবকাশের জন্যও অনেক সময় অঙ্ক বিরতির প্রয়োজন হয়।

নাটকের কোন্ অঙ্ক কত দীর্ঘ হবে সে সম্বন্ধে কোন নিয়মকানুন বেঁধে দেওয়া চলে না। তবে সাধারণতঃ নাটকের প্রথম এবং শেষ অঙ্ক—মধ্যবর্ত্তী অঙ্ক বা অঙ্কগুলির চেয়ে অন্য রকম হয়। নাটকের প্রথম অঙ্ক কৌতূহল সৃষ্টি করে—মধ্যবর্ত্তী অঙ্ক বা অঙ্কগুলি সেই কৌতূহলকে সমানভাবে এগিয়ে নিয়ে যায় বা বাড়িয়ে তোলে—শেষ অঙ্কে কৌতূহল একবারে চরম অবস্থায় উঠে যায় এবং নাটকের যবনিকা নেমে আসে। প্রথম অঙ্কে থাকে চরিত্রের অবতারণা, চরিত্রের যেটুকু অতীত ইতিহাস প্রয়োজন সেইটুকুর বর্ণনা; এই প্রথম অঙ্ক থেকেই নাটকীয় চরিত্রকে হতে হবে একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথে গতিশীল। এত কিছুর সমাবেশ করতে হয় বলেই—সাধারণতঃ প্রথম অঙ্কটা হয় সব চেয়ে দীর্ঘ। শেষ অঙ্কে নাটক অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চরম অবস্থায় এসে পৌঁছায়; তাই শেষ অঙ্কটা হয় অন্য সব অঙ্কের চেয়ে ছোট।

কয়েকটী বিশেষ নির্দ্দেশ

নাট্যকার কি ভাবে নাটক আরম্ভ করবেন এ বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট ভাবতে হবে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। গোটাকতক ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক চরিত্র ব্যতীত নাটকে এমন বহু চরিত্র থাকতে পারে, যাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে দর্শক আগে কিছুই জানে না। সুতরাং নাটক আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই—যত শীঘ্র সম্ভব—দর্শকদের জানিয়ে দেওয়া দরকার, চরিত্রগুলির পরিচয় কি, ঘটনার স্থান কোথায় এবং সময় কি, এবং তাছাড়া নাটকের চরিত্রগুলির অতীত ইতিহাস কি; অর্থাৎ বর্ত্তমানের সঙ্গে তাদের অতীতের কোন্ সম্বন্ধ নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে বিজড়িত।

নাটকে কোন্ চরিত্র বা ঘটনার ওপর জোর (emphasis) দিতে হবে সে বিষয়ে নাট্যকার গোড়াতেই অবহিত হবেন। বার বার বলে, অন্যের সঙ্গে তুলনা করে, অথবা বিশদভাবে বর্ণনা করে—উক্ত ঘটনা বা চরিত্রের প্রাধান্য এবং বৈশিষ্ট্য দর্শককে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। নাটক রচনার সময় নাট্যকারকে ভাবপ্রবণ হলে চলবে না।...কল্পনার স্রোতে ভেসে গেলে নাট্যকারের সৃষ্টি ব্যর্থ হবে। নিজের মন সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে; কোন্ চরিত্র বা ঘটনাকে কতটুকু প্রাধান্য দিতে হবে সে বিষয়ে নাট্যকার যদি সর্ব্বদা সচেতন না থাকেন—পূর্ণাঙ্গ নাট্যরস-সৃষ্টি তাহলে কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।

চরিত্র, পরিস্থিতি (situation) বা কোনও বিশেষ কথার ওপর প্রাধান্য আরোপ করবার একটী উপায় হল—উল্টো ধরণের (contrasting) চরিত্র, পরিস্থিতি বা কথাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করে দেখান। কালো পশ্চাৎ পটে রূপালী ছবি যেমন খোলে—

তেমন আর কিছুতে নয়। মেলোড্রামায় এই সাদা কালোর পাশাপাশি সমাবেশ প্রায় আগাগোড়া দেখতে পাওয়া যায়। চরিত্রের বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে মেলোড্রামার কাহিনীর নায়ককে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই মেলোড্রামায় হিরো বা নায়ককে অনেক সময় দেখতে পাই—একেবারে আদর্শ চরিত্ররূপে, ভিলেন (Villain) হয় একেবারে মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত, এবং নায়িকা হয়...পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি।

•

উল্টোধরণের সিচুয়েশন বা পরিস্থিতির অবতারণা দ্বারা নাটককে বিশেষ ভাবে আকর্ষণীয় করা যায়। ধরুন, কোন নাটকের নায়কের বিবাহ স্থির হয়েছে। কিন্তু সহসা নায়কের জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল অথবা সে এমন একটা সংবাদ পেল—যার ফলে তার পক্ষে নির্দ্ধারিত সময়ে নির্ব্বাচিত পাত্রীকে বিবাহ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কন্যাপক্ষ এসব ব্যাপারের কিছু জানতে পারল না। তাদের আমরা পরবর্ত্তী দৃশ্যে দেখতে পেলুম—মহা উৎসাহের সঙ্গে বিবাহের আয়োজন কর্চ্ছে। নায়ক তার দুঃসংবাদটা অর্থাৎ বিবাহে তার অস্বীকৃতির কথা জানাতে সেখানে এসে হাজির হ'ল। কিন্তু কি করে সে কন্যাপক্ষকে সহসা এত বড় নির্ম্মম আঘাত দেবে—কি ভাবে কথার অবতারণা করবে...বুঝতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কন্যার পিতা বা অন্য কোন নিকট আত্মীয় নিঃসন্দিগ্ধ মনে নায়ককে আশীর্ব্বাদ করলেন—তাদের ভাবী বিবাহিত জীবনের সুখশান্তি কামনা কর্লেন।—ভেবে দেখুন এরূপ পরিস্থিতি দ্বারা নাটক দর্শক মনকে কতখানি ভাবোদ্বেল করে তুলতে পারে।

দর্শক মনে আগ্রহ (Interest) সৃষ্টি নাটকের একটা প্রধান গুণ। নাটক আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আগ্রহ জাগবে—এরপর কি হবে

তা জানবার জন্যে। দৃশ্যের পর দৃশ্যে এই জানবার আগ্রহ বা interest ক্রমেই বেড়ে চলবে। একটী অঙ্ক শেষ হলে, পরের অঙ্ক কতক্ষণে আরম্ভ হবে—সে জন্য দর্শক সাগ্রহে প্রতীক্ষা করবে। নাটকের শেষ যবনিকায় এই আগ্রহ চরমে (Climax) পৌঁছে যাবে। যেখানে আগ্রহের অবসান—নাটকেরও সেখানেই সমাপ্তি। গোড়া থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবে আগ্রহকে বর্দ্ধিত করে নেওয়ার মানেই, নাটককে আদ্যোপান্ত গতিশীল করা। অবিরাম গতি বা Movement নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই নাটকীয় গতি নির্ভর করে...নাট্যকারের বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অনুভূতির ওপর, যথাযোগ্য ঘটনা বা চরিত্রকে উপযুক্ত প্রাধান্য দেবার ওপর, এবং তৃতীয়তঃ আগ্রহ সৃষ্টির ওপর।

পূর্ব্বেই বলেছি, দর্শকের জানবার কৌতূহল বা আগ্রহকে শেষ যবনিকা পর্য্যন্ত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে যেতে হবে। এ জন্য কখনো কখনো কতকগুলি বিষয় দর্শকের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু তাই বলে, বিষয়গুলি দর্শকের কাছে আগাগোড়া ধোঁয়াটে করে রাখলে, দর্শক নাটকের কাহিনী অনুসরণ করতে পারেন না; তার ফলে নাটকের গতি প্রবল হওয়া দূরে থাক—বরং জটিল এবং মন্থর হয়ে পড়ে। তাই সেই লুকোনো ঘটনা বা কথা যথাযোগ্য স্থানে দর্শকের নিকট একে একে উপস্থাপিত করতে হবে।

আগ্রহ ও বিস্ময় (Suspense and Surprise) উভয়ের অবতারণা দ্বারা দর্শককে চরম ভাবে অভিভূত করা যায়। যার সম্বন্ধে আগে খানিকটা জানা যায় বা আভাষ পাওয়া যায়, তাকে আরও বেশী করে জানবার জন্যেই আগ্রহের সৃষ্টি। সুতরাং আগ্রহ জন্মাতে

হলে, আগে থেকে দর্শককে খানিকটা প্রস্তুত করে রাখতে হবে। বিস্ময় বা Surprise নাটকের ভেতর আবির্ভূত হয় অতি আকস্মিক ভাবে। কোন দস্যু হয়তো নাটকের নায়ককে হত্যা করবার জন্য পাহাড়ের ওপর দিয়ে তার পিছনে ছুটে যাচ্ছে। খানিক দূর গেলে সামনে আর পথ নেই; দস্যু নায়ককে প্রায় ধরে ফেলবার উপক্রম করেছে; নায়কের বাঁচবার আর কোন উপায় নেই। দর্শকের মন নায়কের বিপদে অতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠেছে, হয়তো মনে মনে প্রার্থনা জানাচ্ছে, "হে ভগবান! কোন রকমে নায়ককে তুমি রক্ষা কর!" ঠিক সেই মুহূর্তে, পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথে, পশ্চাদ্ধাবনকারী দস্যু যদি পা পিছলে একেবারে নীচে গড়িয়ে পড়ে যায়,—দর্শকেরা আনন্দে কোলাহল করে ওঠে; নায়ক সেই অতর্কিত বিস্ময়ের আবির্ভাবে অর্থাৎ দস্যুর সেই অতর্কিত পদস্খলনে—রক্ষা পেয়ে যায়।···নাটকে এইরূপ আবির্ভাবকেই বলা হয়, বিস্ময় বা Surpriseএর অবতারণা। মেলোড্রামায় Surpriseএর স্থান খুব বেশী; উচ্চস্তরের নাটকে Surprise বা বিস্ময়ের পরিবর্তে বেশীর ভাগ থাকে Suspense বা আগ্রহ।

চরিত্র সৃষ্টি

ঘটনার চমৎকারিত্ব সাধারণ দর্শককে অভিভূত করে; মধুময় সংলাপ প্রশংসা অর্জ্জন করে; কিন্তু নাটককে স্থায়ী মূল্য দেয় বা অমর ক'রে রাখে...তার অনুপম চরিত্র সৃষ্টি। আজ পর্য্যন্ত যে কয়জন নাট্যকার জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন—তাঁদের সাফল্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করলে সবার আগে নজরে পড়বে—চরিত্র সৃষ্টির অসাধারণ দক্ষতা।

নাটকে দুই রকমের চরিত্র পাওয়া যায়; পূর্ণাঙ্গ চরিত্র এবং আংশিক বা জাতি-রূপ-বাচক চরিত্র (Type character)। মানুষের চরিত্রের নানাবিধ রূপ বা অংশ আছে। তার ভেতর থেকে, কোন একটি বা সমধর্ম্মী একাধিক অংশকে বেছে নিয়ে যে চরিত্র সৃষ্টি করা যায়—তাকেই বলা যায় চরিত্রের জাতিরূপ;—নাটকে সেই ধরণের চরিত্রকে বলি আমরা "টাইপ" চরিত্র। মেলোড্রামা এবং হাস্য-রসাত্মক নাটকের কারবার সাধারণতঃ "টাইপ চরিত্র" নিয়ে। এই ধরণের চরিত্রে জটিলতা থাকেনা; পাপী যে, সে বরাবর পাপী; পুণ্যশীল সর্ব্বদা ষোল আনা পুণ্যশীল। তাদের ভেতর অন্য কোন বিপরীত হৃদয়-বৃত্তির আবির্ভাব হয় না, জীবনে তাদের বিভিন্ন চিত্ত ধর্ম্মের সঙ্ঘাত সৃষ্টি হয় না। তাই টাইপ চরিত্র রচনা করাও যেমন সহজ, দর্শকের পক্ষে তার রূপ অনুধাবন করা এবং কার্য্য কলাপ অনুসরণ করাও তেমনি সহজ।

টাইপ চরিত্র যদিও দর্শককে প্রচুর আনন্দের খোরাক যোগায়—তা'হলেও সত্যিকারের নাট্যস্রষ্টা কেবলমাত্র টাইপ চরিত্র রচনা করে তৃপ্ত হতে পারেন না। তাঁর মনে প্রেরণা জাগে, মানব চরিত্রের এক একটী বিশেষ অংশ নিয়ে বিভিন্ন টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করার পরিবর্ত্তে,

পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টি করবার। বিশেষতঃ বাস্তব নাটকে টাইপ চরিত্র আধুনিক দর্শককে আর তেমন খুসী করতে পারে না। কাহিনী যদি আমাদের বাস্তব জীবনের হয়—তা'হলে সে নাট্য-কাহিনীর চরিত্র-গুলিকে আমরা আংশিক চরিত্র রূপে দেখতে চাইনা; আমরা চাই তাকে রক্ত মাংসে গড়া মানুষ রূপে দেখতে। আমরা চাই এমন মানুষ...যার জীবনের মুহূর্ত্তগুলি কখনো আনন্দরসোদ্বেল, কখনও বা গভীর বেদনায় মুহ্যমান; সে মানুষ চলার পথে ভুল ভ্রান্তি করে, আবার শুধরে নেবারও চেষ্টা করে; সে পূর্ণাঙ্গ দেবতাও নয়, দানবও নয়; সে আমাদের এই মাটীর পৃথিবীর নিছক মানুষ। নাটকে বাস্তব জীবনের কাহিনী বর্ণনা করতে হ'লে সে নাটকের চরিত্র গুলিকেও হতে হবে—সম্পূর্ণ বাস্তব।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা স্মরণ রাখা দরকার। পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টি এবং মনস্তত্ব বোধ ঠিক এক জিনিষ নয়। পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টি করতে হ'লে মানব চরিত্রের যে সব হৃদয় বৃত্তির সঙ্গে আমরা সর্ব্বদা পরিচিত—নাট্যকারকে সেই বৃত্তিগুলির সমন্বয় করে নিয়ে, তার সাহায্যে চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। মনস্তত্ববিদ্-নাট্যকার শুধু সেই হৃদয় বৃত্তিগুলির সমন্বয় সাধন করেন না; তিনি মানব চরিত্রে এমন সব নূতন নূতন অংশের আবিষ্কার করেন—যা সাধারণ মানুষের জ্ঞান বা ধারণার বাইরে। অপূর্ব্ব নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে, তিনি তাঁর চরিত্রের এক একটী লুকোনো অংশে আলোকপাত করেন—মানবচরিত্রের সেই অন্তর্নিহিত রূপটি দর্শকেরা তার আগে কখনো কল্পনাও করতে পারে না। অধিকাংশ সুলিখিত নাটকে পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টি দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু মনস্তত্ত্ব বা Psychology'র সন্ধান পাওয়া যায়—কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ নাটকে।

চরিত্রের বিভিন্ন জটিল অংশ নাটকে সর্ব্বদা স্থান পাবে কিনা এ বিষয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন করেন। কোন নাটকের নির্ব্বাচিত পাত্র পাত্রীকে মানবচরিত্রের গোটাকতক বিশেষ অংশ দিয়ে গঠন করলেই হয়তো সেই নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে। যেমন ধরুন—শচীন সেনগুপ্তের "ঝড়ের রাতে" নাটক। কাহিনীর নায়ক—আপন-ভোলা প্রফেসর প্রশান্ত। প্রশান্ত বই পড়ে, গবেষণা করে। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী বিজলী। বিজলীর দিকে তার এতটুকু অশ্রদ্ধা বা বিতৃষ্ণা নাই, অথচ সে তার গবেষণা নিয়ে এমনি মত্ত যে বিজলীকে নারী হিসাবে তার প্রাপ্য—সে কখনও দেয়নি। ট্রাজেডী এইখানে! এবং এই ট্রাজেডীর সুযোগ নিয়ে অতর্কিতে তাদের জীবনে বিরাট আলোড়ন উপস্থিত করল...ঝড়ের রাতের অভ্যাগত বন্ধু প্রভঞ্জন। সদা-প্রশান্তচিত্ত 'প্রশান্ত', ঝঞ্ঝারমত উদ্দাম বিলাত-ফেরৎ 'প্রভঞ্জন', বিজলীর মত চোখ ধাঁধাঁনো রূপ ও বুদ্ধির প্রখরতা···এবং বিজলীর মতই তীব্র অন্তর্দাহময়ী নায়িকা বিজলী! চরিত্র সৃষ্টি হিসাবে—এরা প্রত্যেকে সুন্দর হলেও, এদের ভেতর মানবচরিত্রের সবগুলি অংশের সন্ধান পাইনে। নাটকের পরিস্থিতি মধ্যে যে কয়টী অংশের অবতারণা বা অভিব্যক্তি প্রয়োজন হয়েছে নাট্যকার শুধু সেই কয়টী বিশেষ চারিত্রিক অংশ দিয়ে এদের নির্ম্মাণ করেছেন। যে নাটকে চরিত্র সৃষ্টিই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—সেখানে নাটকীয় প্রয়োজন অনুযায়ী চরিত্রের কয়েকটী বাছাই করা অংশের অবতারণা করলেই চলে; আর···একমাত্র চরিত্র-সৃষ্টিই নাট্যকারের উদ্দেশ্য হলে—চরিত্রের ছোটখাট সমস্ত দিকগুলিই নানাভাবে দেখাবার প্রয়োজন হয়।

জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার Galsworthy এক যায়গায় বলেছেন—

"Character is situation"—"চরিত্রই নাটকীয় পরিস্থিতি।" কথাটা খুব সত্য। পরিস্থিতির উদ্ভব হয় কোথা থেকে? কে নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে?—পরিস্থিতি কখনো আপনা হতে তৈরী হয় না—তাকে তৈরী করে নাটকের চরিত্র। নিজের মনের বিভিন্ন বৃত্তির সঙ্গে, সমাজ-ধর্ম্ম বা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে; অথবা অন্য কোন চরিত্রের সঙ্গে তার যখন সঙ্ঘাত উপস্থিত হয়—সেই সঙ্ঘাতের ফলই হ'ল নাটকীয় পরিস্থিতি। তাই চরিত্রের সামান্য পরিবর্ত্তন হলে, সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিও পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়।

চরিত্র সৃষ্টি নাটকের প্রাণ-শক্তির যে কতখানি—তা বলে শেষ করা যায় না। যে কোন প্রথম শ্রেণীর নাটকের কথা ভেবে দেখুন,—তা থেকে চরিত্রের বিভিন্ন ব্যঞ্জনা বাদ দিলে নাটকের আকর্ষণ আর কতটুকু থাকে? উদাহরণ স্বরূপ, শরৎচন্দ্রের "দেনাপাওনার" নাট্যরূপ "ষোড়শীর" কথা ভাবুন। ষোড়শীর গল্পাংশ মুখে বলতে গেলে কত সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর! সে গল্পের মাধুর্য্য কত-টুকু!...অথচ অপরূপ চরিত্রব্যঞ্জনা, অতুলনীয় মনস্তত্ত্ববোধ কাহিনীটাকে এমন দ্রুত তালে এগিয়ে নিয়ে যায় যে, সমস্ত দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মত শেষ যবনিকা পর্য্যন্ত অভিনয় দেখতে বসে থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলছি; শ্রেষ্ঠ চরিত্র-নাটক হিসাবে শরৎচন্দ্রের নাট্যকাহিনীর বিষয় উল্লেখ করলুম, অথচ রবীন্দ্রনাথের কোন নাটকের উল্লেখ করলুম না কেন—এই প্রশ্ন কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তার জবাব—আমি মঞ্চের সাফল্যমণ্ডিত নাটকের আলোচনা করছি; বিশ্বকবির নাটক মঞ্চ-সফল নাটক নয়। একমাত্র "চিরকুমার সভা" এবং "শেষরক্ষা" ব্যতীত তাঁর অন্য কোনও নাটকের রস দর্শক সাধারণ উপলব্ধি করতে পারেনি। তার একটা

প্রধান কারণ হয়তো এই—রবীন্দ্রনাথের অতি সূক্ষ্ম রসবোধ রঙ্গমঞ্চের দর্শক মনে রসের আবেদন উপস্থিত করতে পারে না। উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ পাঠ করে, তার রস আস্বাদন করা চলে; কবি এবং ঔপন্যাসিক পাঠকের সঙ্গে থেকে দুরূহ স্থানগুলি নিজে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু নাট্যাভিনয়ে সে অবকাশ নেই...একবার শোনা বা একবার মাত্র দেখার সঙ্গে দর্শক মর্ম্মোপলব্ধি করতে না পারলেই মঞ্চনাটক ব্যর্থ হয়ে যায়। সব দেশের সব কালের মানুষের রসবোধ সমান নয়...এবং একই দেশে একই কালে সব মানুষের রসবোধও সমান নয়। মঞ্চনাটক সর্ব্বসাধারণের অথবা জনগণের বৃহত্তম অংশের বোধগম্য হওয়া দরকার। এই বিশেষ শ্রেণীর বোধগম্য নয় বলেই রবীন্দ্রনাথের বিরাট সৃষ্টি আমাদের মঞ্চে সাফল্য অর্জ্জন করেনি।

চরিত্র সৃষ্টির পূর্ব্বে নাট্যকারকে কল্পিত চরিত্রটির যথার্থরূপ মনে মনে বিশদভাবে চিন্তা করে নিতে হয়। চরিত্রটির কোন্ কোন্ হৃদয়বৃত্তি দর্শকের সামনে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করতে হবে... সেই চরিত্রের কোন্ পরিস্থিতিতে কি কাজ করা স্বাভাবিক, কি কাজ করা অসঙ্গত, সে বিষয়ে নাট্যকারের পূর্ব্ব হতেই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। নূতন নাট্যকারেরা চরিত্রের বিভিন্ন দিক খুব ভাল করে না ভেবেই, অনেক সময় তাদের নাটকের মধ্যে এনে ছেড়ে দেন। নাটকের চরম মুহূর্ত্ত বা climax উপস্থিত হলে, দর্শকের মনে চূড়ান্ত উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, অনেক সময় চরিত্রটীকে দিয়ে এমন কথা বলান্, বা এমন কাজ করান্, যা নাকি চরিত্রটীকে যেভাবে গড়ে তোলা হয়েছে...তার পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ নয়। উত্তেজনা-ময় নাটকীয় পরিস্থিতির মাঝখানে চরিত্রের সেই অসামঞ্জস্য সাময়িক

ভাবে হয়তো বা দর্শকের চোখে না পড়তে পারে; কিন্তু নাট্য-কারের পক্ষে এটা যে সৃজন-ক্ষমতার দৈন্য···সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নাটকে "প্রবেশ" ও "প্রস্থান" (exits & entrances) চরিত্র ব্যঞ্জনায় যথেষ্ট সাহায্য করে। নাটকের কোন্ চরিত্র কখন প্রথম দেখা দেবে—তা নির্ভর করে চরিত্রের গুরুত্বের ওপর...এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তার সম্বন্ধে পূর্ব্বে দর্শক মনকে কতটা তৈরী করে রাখা হয়েছে! নাটকের নায়ক নায়িকাকে সাধারণতঃ আগে চোখের আড়ালে রাখা হয়; যখন দর্শক তাদের দেখবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠে, সেই নাটকীয় মুহূর্ত্তে হয় তাদের প্রথম আবির্ভাব। যে চরিত্রের প্রাধান্য যত বেশী, নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সে তত বেশী বিজড়িত থাকে; সুতরাং তাকে হাজির করবার আগে তার সম্বন্ধে দর্শককে বহুপূর্ব্ব থেকেই যথেষ্ট সচেতন করে রাখতে হয়। বলা বাহুল্য যে, দর্শককে প্রধান চরিত্রের আগমন বিষয়ে সচেতন করে রাখে নাটকের পূর্ব্বাগত অপরাপর চরিত্র—তাদের কথার সাহায্যে···তাদের কার্য্য-কলাপে। "প্রবেশের" ন্যায় "প্রস্থান"ও চরিত্র-রূপায়ণে যথেষ্ট সাহায্য করে। উদাহরণ স্বরূপ, Hamlet নাটকের Ghost Sceneএ Hamletএর প্রস্থান কত-খানি সঙ্কেতময় ভেবে দেখুন। অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখরের" প্রতাপ যেখানে মৃদুহেসে "আমার প্রয়োজন আছে"···শুধু এই কথাটি বলে প্রস্থান করে; সেই প্রস্থানের ইঙ্গিতটুকু মনে করে দেখুন।

নূতন লেখকেরা নাটকে চরিত্র আমদানী করতে বিশেষ বাদ বিচার করেন না। একটী বা দুটী সাধারণ কথা বলবার জন্যেও নূতন নূতন

চরিত্রের অবির্ভাব হয়ে থাকে। এই সব অনাবশ্যক চরিত্র নাটকের সাবলীল গতির পথে কেবল বাধা জন্মায়। নাট্যকার একটু সতর্ক হলে, এই সব চরিত্র অনায়াসে বাদ দিতে পারেন এবং যে সামান্য দু'একটী কথা বলাতে তাদের নাটকে টেনে 'এনেছিলেন···তা নাটকের অপরাপর চরিত্রের মারফতে প্রকাশ করতে পারেন। নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে যে কয়টী চরিত্রের অবতারণা একান্ত অপরিহার্য্য, শুধু তারাই নাটকে স্থান পাবে এবং সেও শুধু নাটকীয় প্রয়োজন সিদ্ধির সময় টুকু পর্য্যন্ত। চরিত্রের প্রয়োজনীয় কার্য্য শেষ হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে নাটক থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।



নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ



নাট্যকার মন্মথ রায়



নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

সংলাপ

নাটকীয় সংলাপ বা dialogueএর প্রথম কাজ ··অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘটনা বর্ণনা করা। শ্রোতার নিকট সংলাপ স্পষ্টরূপে বোধগম্য না হলে, কাহিনী অনুসরণ করা সম্ভব হয় না; ফলে আগ্রহ ও কৌতূহল কমে যায়। অনেক সময় আবার এমনও দেখা যায় যে, সংলাপ হয়তো বোধগম্য হয়েছে···কিন্তু কথার বাঁধুনি তেমন মনোরম নয় বলে— নাটকের রস পুরোপুরি উপলব্ধি করা যাচ্ছেনা। কাজেই, শুধু ঘটনার বর্ণনা করলেই তাকে নাটকের উপযোগী সংলাপ বলা চলে না; তাকে হতে হবে সুনির্ব্বাচিত, মনোরম।

আগেই বলেছি, উচ্চাঙ্গের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য—অনুপম চরিত্র সৃষ্টি। আমরা নাটকীয় চরিত্রকে বুঝতে পারি তার কথায় বা সংলাপে এবং কাজে। সংলাপ চরিত্রের আসল রূপটী আমাদের চোখের সামনে ধরে দেয় এবং সেই সঙ্গে নাটকের ঘটনাগুলি বুঝিয়ে দেয়। উচ্চাঙ্গের সংলাপ বলব তাকে.. যার মধ্যে ঘটনা বর্ণনার প্রচেষ্টা নেই; চরিত্র ব্যঞ্জনাই যার প্রধান লক্ষ্য। সংলাপে চরিত্র সার্থকভাবে অঙ্কিত হলে—সেই চরিত্রের ভেতর দিয়েই আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে নাটকের ঘটনা যথাযথরূপে বুঝতে পারি।

নাট্যকার যে সংলাপ রচনা করেন—সে তাঁর নিজের কথা নয়; তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির কথা। নাটকীয় চরিত্র ও নাটকের দর্শক— এদের দু'জনকার মাঝখানে নাট্যকার হলেন—ভাবের বাহক। চরিত্রের মনোভাবগুলি তিনি সংলাপের সাহায্যে দর্শক এবং শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেন।

বর্ত্তমান কালে সমস্যামূলক বা Problem Playর বহুল প্রচলন

হয়েছে। এই সব সমস্যামূলক নাটকে এবং অতি আধুনিকতম তথাকথিত গণ-নাট্যে দেখা যায়—চরিত্রগুলি নানা বিষয় বিচার কর্চ্ছে, তর্ক কর্চ্ছে, অভাব জানাচ্ছে, দাবী জানাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই চরিত্রের এই সব বিচার বিতর্কের ভিতর নাট্যকারের নিজস্ব মতবাদ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। চরিত্র যা বলে—তা তা'র চরিত্রোপযোগী নয়; মনে হয় নাট্যকার কতকগুলি চরিত্র দাঁড় করিয়েছেন. তাদের মুখ দিয়ে কেবল নিজের কথাই বলাবার জন্যে। সমস্যামূলক নাটক বা গণনাটক দেশের যথেষ্ট উপকার করতে পারে সন্দেহ নাই। এ ধরণের নাটক রচনা করতে হলে নাট্যকারকে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে; সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ভাবে বিভোর হয়ে, তিনি চরিত্র সৃষ্টি করতে ভুলে না যান। চরিত্রের সংলাপ যেন ঠিক ভাবে চরিত্রের উপযোগী হয়।

বর্ত্তমানের চলতি ভাষায় নাটকের সংলাপ রচনা কর্ত্তব্য—এই ভ্রান্ত ধারণা অনেক প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকারের মধ্যেও রয়েছে। যে ধরণের ভাষা আধুনিক কালের সাহিত্যে ব্যবহৃত হচ্ছে অথবা নাট্যকার নিজে যেভাবে কথা বলতে ভালবাসেন—ঠিক সেই ভাষায় চরিত্রের সংলাপ রচনা করতে তাঁরা প্রবৃত্ত হন। যিনি নিজে গুরুগম্ভীর ভাষার পক্ষপাতী. তাঁর নাটকের রাজা মহারাজা থেকে আরম্ভ করে দূত, প্রতিহারী পর্য্যন্ত বিরাটকায় সমাসবদ্ধ ভাষায় কথা বলবে—এর চেয়ে হাস্যকর আর কি হতে পারে? সভাপণ্ডিত যত খুসী সমাসবদ্ধ ভাষায় কথা বলুন, রাজা রাজোচিত ভাষায় বলুন, এবং দূত প্রতিহারী তাদের নিজস্ব সমাজের ভাষা ব্যবহার করুক—তবে তো বলব তাকে নাটকীয় সংলাপ! আমাদের দেশে চরিত্রের তারতম্য

অনুযায়ী সংলাপের তারতম্য মহাকবি গিরিশচন্দ্রের নাটকে যত দেখা যায় তেমন বোধ হয় আর কোনো নাটকে নেই। "নীলদর্পণ" রচয়িতা দীনবন্ধুও এইদিক দিয়ে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে রসরাজ অমৃতলাল বোসের "যাজ্ঞসেনী" নাটকের উল্লেখ কচ্ছি। এই নাটক রচনার সময় গুপ্ত-কবির অনুপ্রাস রসরাজকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে—তাঁর মত দক্ষ নাট্যশিল্পীও চরিত্র স্থষ্টির চেয়ে প্রাধান্য দিয়ে বসেছেন—অনুপ্রাস বা Alliterationকে। যাজ্ঞসেনীর শকুনি বলছেন:

"গান্ধার-সন্ধান শিখে নাই অবন্ধুর বাসী।"

অর্জ্জুন বলছেন:

"ঊর্দ্ধে, ঊর্দ্ধে, ঊর্দ্ধে ততোধিক—
ভূলোক দ্যুলোক পারে গোলোক আলোকে
কমলারে হেরি, যার অমলা তুলনা,
চিরাভীষ্টা সেই কৃষ্ণা—
দৃষ্টির দীপ্তিতে—
উত্তপ্ত করিয়া মোর জীবনের শক্তি—" ইত্যাদি।

অনুপ্রাস অমৃতলালকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল বলেই—নিজে একজন শ্রেষ্ঠ নট, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হয়েও—"যাজ্ঞসেনী" নাটকে তিনি দর্শকদের পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে পারেননি।

নাটকের সংলাপ রচনা করবার সময় বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে মিশে

গিয়ে তাদের ভেতর থেকে নাট্যকারকে কথা বলতে হবে। সংলাপে সাহিত্যিক-মূল্য আরোপ করবার লোভ সম্বরণ করতে হবে। কোন সাহিত্যিকের চরিত্র হলে—একমাত্র তারই মুখে শোভা পায়...সাহিত্যিক-সংলাপ বা literary dialogue!

সুস্পষ্ট সংলাপ নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সে কথা আগে বলেছি। স্পষ্টতার সঙ্গে ভাষার সংযমও নাট্যকারকে বিশেষরূপে আয়ত্ত করতে হবে। প্রয়োজনীয় কথা ব্যতীত আর কোন কথা নাটকে ঠাঁই পাবে না; একটী প্রয়োজনীয় কথা বললে যেখানে উদ্দেশ্য-সিদ্ধ হয়—সে কথাটীর দ্বিরুক্তি করাও চলবে না। কথার ভারে নাটকের গতি যেন কোথাও মন্থর হয়ে না যায়। নাটকের চরিত্রের মঞ্চে রূপদান করবার জন্যে রয়েছেন নট-নটী। তাঁরা ভাবের অভিব্যক্তি দিয়ে—অথবা মূক অভিনয়ের সাহায্যে চরিত্র রূপায়ণে নাট্যকারকে যে সহায়তা করেন—কথাসাহিত্যিক সর্ব্বদা সে সাহায্য হতে বঞ্চিত হন। তাই কথাসাহিত্যের চরিত্রের পক্ষে যে সংলাপ বিশেষ আবশ্যক—নাটকে তা ঢের বেশী সংক্ষিপ্ত হলে নাটকীয় চরিত্রের কোন ক্ষতি হয় না। Dumas এক যায়গায় বলেছেন—"নাটক লেখার সময় কতগুলি শব্দ ব্যবহার করতে হবে তা নিয়ে মুস্কিল নয়...মুস্কিল হ'ল···কতগুলি শব্দ ব্যবহার করতে হবে না—তাই নিয়ে।"

দীর্ঘ স্বগত ও পরোক্ষ উক্তি (Soliloquy & Aside) নাটক থেকে প্রায় উঠে যাবার উপক্রম হয়েছে। কারণ এরূপ সংলাপ বড়ই অস্বাভাবিক। কোন চরিত্র পরোক্ষে উক্তি কর্চ্ছে, তার মানে এই যে, তার সংলাপ পার্শ্ববর্ত্তী চরিত্রটী শুনতে পাবে না। অথচ এমনি

বিচিত্র, অভিনেতাকে সেই সংলাপ প্রেক্ষাগৃহে সর্ব্বশেষ আসনে উপবিষ্ট দর্শককেও শোনাতে হবে! দীর্ঘ স্বগত উক্তিও অস্বাভাবিক; কারণ, একটী চরিত্র অনর্গল বলে যাবে—আর পার্শ্বের চরিত্রটী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণে দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হবে এই আশায়—মানুষের জীবনে আমরা এরূপ ঘটতে দেখি না।··· সেকালে নাটকের স্বগত উক্তি বা পরোক্ষ সংলাপ চরিত্র ব্যঞ্জনায় যথেষ্ট সাহায্য করতো সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তব-জীবনে এরূপ উক্তি অস্বাভাবিক বলে—নাটকে এর পরিবর্ত্তে মূক অভিনয় স্থান পেয়েছে। আগের কালে যেখানে স্বগত বক্তৃতা চলত...এখন সেখানে চরিত্রের মূক অভিনয় বা ভাব অভিব্যক্তির সঙ্গে প্রয়োজন মত সামান্য দু'একটী হর্ষ বা বিষাদসূচক ধ্বনি (Exclamation) যোগ করে—একই ধরণের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

নাটক ও দর্শক

দর্শকের রুচিকে উপেক্ষা ক'রে মঞ্চ-নাটক অভিনীত হতে পারে না। দর্শক কোন্ জিনিষ পছন্দ করে—কোনটা করে না—এ জ্ঞান নাট্যকার মাত্রেরই থাকা প্রয়োজন। এককালে নাটক পাঁচঘণ্টা কি তারও বেশী সময় অভিনীত হ'ত, এখন সেখানে আড়াইঘণ্টা বা তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়েছে। তার কারণ কি? কারণ এই, যে—বর্ত্তমানের দর্শক ওর বেশী সময় এক জায়গায় বসে অভিনয় দেখতে অস্বস্তি ও ক্লান্তি বোধ করেন। বেশী বড় নাটকের অভিনয় দেখতে দর্শকের আজকাল ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে বলেই নাটকের কাহিনী আড়াই বা তিনঘণ্টার মত সংক্ষিপ্ত হয়েছে। সুতরাং নাট্যকারকে দর্শকের চাহিদার ওপর নির্ভর করতে হয় অনেকখানি। কিন্তু তা বলে সর্ব্বতোভাবে দর্শকের ইচ্ছানুযায়ী নাটকের নিজস্বগতি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। যে নাটকের স্বাভাবিক পরিণতি বিয়োগান্ত বা tragic, দর্শকের ইচ্ছানুযায়ী তাকে জোর করে মিলনান্ত করা কোন নাট্যকারের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় নয়। হয় তো সাময়িকভাবে তখন দর্শকেরা খুসী হয়ে বাহবা দেবে; কিন্তু তবু জোর করে মধ্যপথে বা শেষ অঙ্কে গতি ফিরিয়ে দেওয়া মানে নাটককে হত্যা করা; আর্টকে হত্যা করা। নাটকীয় চরিত্রকে তার স্বাভাবিক ধর্ম্মপালন করতে দিতে হবে। তাঁর নাটক তখনই হবে বিয়োগান্ত, যখন চরিত্রগুলি তাদের কার্য্য প্রণালী দ্বারা সেই চরম বিয়োগ বেদনার সৃষ্টি কচ্ছে; তখনই হবে নাটক মিলনান্ত, যখন চরিত্রগুলির মধ্যে সেই পরমতম মিলনের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কখনও দর্শক রুচির দাসত্ব করেন না। তবু দর্শকের মনোবৃত্তির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা দরকার। সাধারণ দর্শকের শতকরা নব্বই জনই যে কোনো নাটক দেখতে এসে

নাটকের ভাবের (idea) চেয়ে চরিত্রগুলিকে পছন্দ করে বেশী এবং চরিত্রের চেয়ে ঘটনা বা কাহিনীকে পছন্দ করে আরো বেশী। কিন্তু তা বলে কোন একটী বিশেষ ভাব বা সমস্যা নিয়ে নাটক রচনা না করে নাট্যকার কেবল চরিত্র ও কাহিনী প্রধান নাটক লিখবেন—আমি একথা বলছি না। সাধারণ দর্শক, চরিত্র ও কাহিনী-প্রধান নাটক পছন্দ করে বলে—সমস্যামূলক নাটক রচনা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সে ধরণের নাটক দর্শককে তৃপ্তি দিতে পারে—যদি সেই বিশেষভাব বা সমস্যাটী চরিত্র বা কাহিনীর ভেতর দিয়ে সুকৌশলে ব্যক্ত করতে পারেন। নাট্যকার যে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে চান্ তাঁকে সেখানে যেতে হবে···দর্শক তাঁকে যে রাস্তায় যেতে বলছে সেই রাস্তা ধরে।

নাট্যকারের হয়তো কোন একটী চরিত্রকে সব চেয়ে ভাল লাগল। তিনি তাকেই নায়করূপে অঙ্কিত করলেন। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখা উচিত, তিনি যে চরিত্রটীকে নায়করূপে গড়ে তুললেন, দর্শকের পরিপূর্ণ সহানুভূতি তার দিকেই কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকছে কি না। হয়তো এমনও হতে পারে, ধীর-গম্ভীর সেই নায়ক-চরিত্রের পাশাপাশি আর একটী এমন হাল্কা ধরণের চরিত্র রয়েছে যাকে নাট্যকার নায়করূপে গড়ে তোলেননি; অথচ সে তার হাসি, গান, আনন্দ দিয়ে দর্শককে অভিভূত করে ফেলল—নায়ক তলিয়ে গেল···গোটা নাটকখানা ব্যর্থ হয়ে গেল।

নাটকীয় চরিত্র যে সব কাজ কর্চ্ছে—তা সে কেন কর্চ্ছে, তার কাজের হেতু কি···কেন সে একাজ না করে অন্য রকম কাজ কর্চ্ছে না—এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক সময় নাট্যকার এবং দর্শকের মধ্যে

মতান্তর ঘটে এবং তার ফলে নাটক মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কার্য্যকারণ সম্পর্কটী দর্শক যদি বুঝতে না পারে, সে নাটক কিছুতে অভিনয়ে জম্‌তে পারে না। নাট্যকার হয় তো মনে মনে জানেন—তাঁর চরিত্র ঠিক কাজই কর্চ্ছে, সে একটুও ভুল পথে যায়নি—কিন্তু পরিষ্কারভাবে নাট্যকারের মনের এই সত্য ধারণাকে প্রমাণ করে না দেখালে দর্শক তা মেনে নিতে রাজী নয়। সবাই যদি জানে "আমি মিছে কথা বলছি"—তখন "আমি সত্য বলছি" বলে বারবার প্রতিবাদ করবার যেমন কোনো মানে হয় না; তেমনি দর্শকের কাছে কার্য্য-কারণ সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যভাবে বর্ণিত না হলে চরিত্রের কোন কার্য্যই সে সত্য বলে মেনে নিতে রাজী নয়।

আগেই বলেছি দর্শক-রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে নাটক রচনা এবং দর্শকের দাসত্ব করা এক কথা নয়; নাট্যকার তাঁর ভাবের দিক থেকে থাকবেন স্বাধীন; সেই ভাবকে যে রূপ দেবেন—তা যেন হয় দর্শকের পছন্দ অনুযায়ী। কারণ, আমি যে নাট্যকারের বিষয় আলোচনা কর্চ্ছি তিনি মঞ্চের এবং মঞ্চ হ'ল দর্শকের।

নাটকের স্বরূপ

নাটকের স্বরূপ কী? "নাটক" বলতে আমরা কি বুঝি? কোন্ বিশেষ গুণ থাকার দরুণ সাহিত্যের আর সব বিভাগ থেকে একে একটী আলাদা পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া হয়? এই বিষয়ে সামান্য আলোচনা করে বর্ত্তমান নিবন্ধ শেষ করব।

ফরাসী নাট্য সমালোচক ফার্ডিনাণ্ড ব্রুন্তিয়ার (Ferdinand Brunetiere) রঙ্গমঞ্চের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন: "রঙ্গমঞ্চ মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রসারের ক্ষেত্র; এখানে প্রতিকূল দৈব, ঘটনা এবং অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করে মানব-শক্তি বিস্তৃতি লাভ করে।" নাটক সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: নাটক বলতে আমরা বুঝি মানুষের মনোবৃত্তির অবিরাম সংগ্রাম। মানুষ প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে সেই সব অদৃশ্য বা প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে—যে সব শক্তি মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে সীমাবদ্ধ ও খর্ব্ব করে রাখতে চায়। নাটকে দেখি···যেন আমাকেই, অথবা আমারই ঠিক পাশের আর একটী মানুষকে মঞ্চের ওপর তুলে দেওয়া হয়েছে—সমাজনীতি, কুসংস্কার, মূঢ়তা, সমস্ত কিছুর সঙ্গে অবিরাম লড়াই করতে। এ সঙ্ঘর্ষ বহির্জগতের সমস্ত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, আবার বহুক্ষেত্রে নিজের মনের সঙ্গে।

*　　*　　*　　*

স্কচ্ নাট্য সমালোচক উইলিয়াম আর্চার (William Archer) ব্রুন্তিয়ারের মতবাদ সম্বন্ধে সমালোচনা করে বলেছেন:

সঙ্ঘর্ষ বা conflict অধিকাংশ নাটকের ভেতর থাকতে পারে;

কিন্তু প্রত্যেক নাটকেই থাকবে তার কোন মানে নেই। যে নাটকে সঙ্ঘর্ষ অর্থাৎ বিপরীত কোন শক্তির সঙ্গে লড়াই রয়েছে, সে নাটকে প্রত্যেক দৃশ্যেই যে সঙ্ঘর্ষ থাকতে হবে অথবা প্রত্যেক চরিত্রই সঙ্ঘর্ষময় হবে—একথাও বলা চলে না।

সঙ্ঘর্ষ মানুষের জীবনের একটা মস্তবড় নাটকীয় ব্যাপার এবং প্রায় প্রত্যেক নাটকেই একভাবে বা অন্যভাবে সঙ্ঘর্ষ স্থান পেয়ে আসছে। কিন্তু তাই বলে নাটকমাত্রেই সঙ্ঘর্ষ থাকা অনিবার্য্য অথবা সঙ্ঘর্ষ না থাকলে নাটকের কোনো আবেদন থাকে না—ব্রুনতিয়ারের এই মত সত্য নয়।

নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা নিদর্শন হল সঙ্কটময় মুহূর্ত্তের (Crisis) অবতারণা। এক সমস্যার পর আর এক সমস্যায়, এক সঙ্কটের পর আর এক সঙ্কটে, এক চক্রান্তের পর আর এক চক্রান্তে পতিত হয়ে নাটকীয় চরিত্রকে চরমতম পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে হয়।

সঙ্কটময় মুহূর্ত্তগুলি নাটকের প্রধান উপাদান হলেও মানবজীবনের সকল প্রকার সঙ্কটই নাটকীয় গুণ সম্পন্ন হয় না। মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হওয়া, ক্রমাগত রোগে কষ্ট পাওয়া, অথবা আর পাঁচজনকার মত নিতান্ত মামুলী ধরণের বিয়ে করা—এ সব হয়তো কারুর জীবনে সমস্যা বা সঙ্কট হয়ে দাঁড়াতে পারে; কিন্তু যেহেতু এগুলি সত্যিকারের জীবনে "সঙ্কট" হয়েছে, তাই বলে নাটকীয় "সঙ্কট" রূপে এদের নাটকে স্থান দিতে হবে···তার কোনো মানে নাই।

এখানে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, নাটকীয় গুণসম্পন্ন বলতে কি বুঝব?

বুঝব—সেই সব সঙ্কটময় মুহূর্ত্তকে—যেগুলি সর্ব্বজনকে অথবা সর্ব্ব-জনের বিরাট অংশকে আগ্রহান্বিত, উৎকণ্ঠিত কিম্বা উত্তেজিত করে।

*　　*　　*　　*

ইংরেজ সমালোচক হেনরী আর্থার জোন্স্ পূর্ব্বোক্ত দু'টী মতবাদকে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে নাটকে সঙ্কট ও সঙ্ঘর্ষের অবতারণার অর্থ একই। আর্চার নিজেই স্বীকার করেছেন যে, সকল প্রকার সঙ্কট বা সমস্যা, যা নাকি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায়, তাকেই যে নাটকে স্থান দেওয়া যায় তার কোন মানে নাই।

সব সঙ্কট নাটকীয় না হলেও সকল প্রকার সঙ্ঘর্ষ কিন্তু নাটকীয় হতে পারে। আর্চার কতকগুলি সঙ্কটময় পরিস্থিতিকে নাটকের প্রধান উপাদান বলেছেন। তিনি সঙ্ঘর্ষ বা Conflictকে আমল দেন নাই। যদি একটু তলিয়ে দেখতেন—তাহ'লেই বুঝতে পারতেন, সঙ্কট বা সমস্যা এলেই তার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষও অনিবার্য্য। এই সংঘর্ষ কখনো হয় বহির্মুখী, কখনও বা অপ্রত্যক্ষভাবে নিজের কাজ করে যায়।

যে সব নাটকে বা দৃশ্যে আর্চার কোন সঙ্ঘর্ষ নেই বলেছেন, সেখানেও সঙ্ঘর্ষ আছে অন্তঃসলিলা ধারার মত চোখের আড়ালে। লোহার কাঠামোর ওপর ইঁট, সুরকী, সিমেণ্ট চাপিয়ে বাড়ী তৈরী হলে ভেতরের কাঠামো চোখে দেখা যায় না; কিন্তু তা বলে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করলে বা সেই কাঠামোকে বাড়ীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় মনে করলে—গোটা বাড়ীখানাই যে ধ্বসে পড়বে!

ব্রুনতিয়ারের "সজ্ঘর্ষ" এবং আর্চারের "সঙ্কট"—এই উভয়ের সঙ্গে অবিভাজ্য সম্বন্ধ আছে। নাটকে এর একটা থাকার অর্থই আর একটা থাকা। এঁদের উভয়ের মতবাদকে মিলিয়ে নাটকের স্বরূপ নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা চলে :

কোন নাটকীয় চরিত্র, জ্ঞাতসারে হোক্, কিম্বা অজ্ঞাতসারে হোক, যখন অপর কোন চরিত্রের, পরিস্থিতির কিম্বা ভাগ্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়···তখনই হয় নাটকের সূচনা। নাটকীয় চরিত্রের চারিপাশে বিপদ কেমন ঘনীভূত হয়ে আসছে, কিম্বা তার অগ্রগতির সামনে বাধা কেমন দুর্ল্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠছে—এ খবর যখন দর্শকেরা জানতে পারে, বুঝতে পারে, অথচ চরিত্রটী নিজে সেই আসন্ন ঝঞ্ঝার কোন পূর্ব্বাভাষ পায় না—নাটকের রস তখন আরো বেশী জমাট হয়ে ওঠে। এই ভাবে নাটকের আরম্ভ হয়; যতক্ষণ চরিত্র বা চরিত্রগুলি সম্মুখবর্ত্তী সঙ্কটের কথা না জানতে পারে নাটক ততক্ষণ এগিয়ে চলে। এর গতি প্রবলতম হয়ে ওঠে, যখন বিরুদ্ধ-বাদী চরিত্র, পরিস্থিতি অথবা অদৃষ্টের ওপর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই প্রতিক্রিয়া বা সজ্ঘর্ষ হতে পারে বাহ্যিক, মানসিক কিম্বা আত্মার। প্রতিক্রিয়া বা সজ্ঘর্ষ সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নাটকেরও গতিপথে নেমে আসে সমাপ্তির যবনিকা। নাটকীয় চরিত্রকে যে সব বাধা অতিক্রম করতে হবে, তা যদি আর একটী সম-বলশালী চরিত্রের ইচ্ছাতেই সৃষ্ট হয়ে থাকে—তা হলে সেই উভয় চরিত্রের ইচ্ছাশক্তির সজ্ঘর্ষ চরম উত্তেজনাময় মূর্ত্তি নেয়।

এই প্রসঙ্গে নাটক ও মঞ্চ সম্বন্ধে হেনরি আর্থার জোন্স তিনটী অত্যন্ত দরকারী কথা বলেছেন; তার উল্লেখ করলুম :—

(১) কোনজাতি সত্যিকারের নাটকের গর্ব্ব করতে পারে না— যদি সেই নাটক তার জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়। প্রত্যেক নাট্যকারের কর্ত্তব্য, মঞ্চসাফল্যের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টি যেন সাহিত্যের আসরেও সাফল্যলাভ করে···সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। নাটক সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়লে, তার ভেতর দিয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা মঞ্চের সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং তার ফলে মঞ্চের যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা থাকবে।

(২) নাটক জনগণকে আনন্দ দেবার জন্য; কিন্তু এই আনন্দের ভেতর দিয়ে জন-চেতনার উদ্বোধন করা প্রত্যেক নাট্যকারের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(৩) যে দেশে নাটক সম্পূর্ণভাবে মঞ্চের অধীন হয়—নাট্যকার যে দেশে মঞ্চের দাসত্ব করেন—সেখানে নাটকের অবনতি অনিবার্য্য। নাটক ও নাট্যকারকে যে দেশ ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে—যেখানকার নাট্যমঞ্চ নাটককে তার প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে জানে—সে দেশে নাটকের সঙ্গে নাটমঞ্চও পরম গৌরবান্বিত হয়।

মাকড়-শিল্পী



নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার



বাণীবিনোদ নির্ম্মলেন্দু



দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালক

পরিচালক (Director) নাটকের পরিপূর্ণ মঞ্চরূপের নিয়ন্তা। নাট্যকার নাটক রচনা করেন। পরিচালক প্রথমে সেই নাটক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করেন। তার ভেতর চরিত্রাঙ্কণে যদি কোথাও কোন অসঙ্গতি পান, ঘটনার কার্য্য-কারণ বর্ণনায় যদি কোথাও কোন অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করেন···অথবা সকল প্রকার সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও যদি কোথাও কোন বাহুল্য, বা অকারণ পুনরুক্তি থাকে, কিম্বা বক্তব্য বিষয়গুলি সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট না হয়ে থাকে—তিনি সেই সব ত্রুটী সংশোধন করে নেন। মোটকথা, নাটক মঞ্চে রূপায়িত হবার সময় সবচেয়ে সহজে এবং সবচেয়ে বেশী করে দর্শকের চিত্তাকর্ষক যাতে হয়—পরিচালক তাকে সেইভাবে সাজিয়ে নেন। তাই অনেক সময় দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ কবি বা অতি উচ্চস্তরের চরিত্রাঙ্কণদক্ষ সাহিত্যিকের রচনাও পরিচালক অনেক স্থানে মঞ্চের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং পরিবর্জ্জন করেন। এখানে সামান্য পরিবর্ত্তনের একটী উদাহরণ দিচ্ছি : Lord Tennyson রচিত Becket নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য পূর্ব্বে এইভাবে ছিল :

Enter Rosamund de Clifford, flying from Sir Reginald Fitz Urse, drops her veil.

Becket. Rosamund de Clifford !

Rosamund. Save me, father, hide me—they follow me—and I must not be known.

Becket নাটককে মঞ্চে রূপদানের সময় Sir Henry Irving পূর্ব্বোক্ত কথা কয়টীকে এইভাবে সাজিয়ে নিয়েছিলেন :

Enter Rosamund de Clifford. Drops her veil.

Rosamund. Save me, father, hide me.

Becket. Rosamund de Clifford !

Rosamund. They follow me—and I must not be known.

কথাগুলিকে এইভাবে সাজিয়ে নেবার আবশ্যকতা কি ? Rosamund, নাটকে এই প্রথম দেখা দিচ্ছে, সুতরাং গোড়ায় তাকে দর্শকের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া প্রয়োজন। সে বিপদে পড়ে যখন ছুটতে ছুটতে মঞ্চে প্রবেশ করল দর্শকেরা হঠাৎ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, ভাবল 'মেয়েটা কে ?' সে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি Becket তার পরিচয় দেন "Rosamund de Clifford"···তাহলে তার ছুটে আসবার ব্যস্ততার মধ্যে দর্শকেরা হয়তো Becketএর কথা ভাল করে শুনতেই পাবে না—মেয়েটীর পরিচয় সেই ব্যস্ততার মধ্যে হারিয়ে যাবে। তাই Irving প্রথম কথা দিলেন Rosamundএর মুখে—"Save me, father, hide me." "আমায় বাঁচাও বাবা, আমায় লুকিয়ে ফেল"।···এই কথা কয়টী শুনে দর্শক মেয়েটীর বিষয়ে যখন আরও কৌতূহলী হল, তার পরিচয় জানবার জন্যে আগ্রহশীল হ'ল—ঠিক সেই সময়ে Irving, Becketকে দিয়ে, তার পরিচয় দেওয়ালেন—"Rosamund de Clifford !" এই সামান্য পরিবর্ত্তনের দ্বারা পরিচালক নাটকের উদ্দেশ্য যে অনেক বেশী সফল কর্ল্লেন তা বলাই বাহুল্য।

নাটক যথাযথ ভাবে সাজানো হয়ে গেলে, পরিচালক তার মঞ্চরূপ

কল্পনা করেন। নাটকের চরিত্রগুলিকে মঞ্চে রূপ দেন অভিনেতা; দৃশ্য পরিকল্পনাকারী দৃশ্য যোজনা করেন, সুরশিল্পী, দীপদক্ষ (Light Expert) প্রভৃতি শিল্পীরা নাটকের বিভিন্ন অঙ্গসজ্জা করেন।

পরিচালক এঁদের কাছে নাটকের চরিত্র ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন, নাটকখানিকে তিনি মঞ্চে কিভাবে রূপায়িত করে তুলতে চান— তা বিশদভাবে বর্ণনা করেন। অভিনেতা, সুরস্রষ্টা, দীপদক্ষ প্রভৃতি শিল্পী, পরিচালকের কাছ থেকে নাটকের সমগ্ররূপ এবং তাঁদের প্রত্যেকের ওপর নাটকের যে যে বিশেষ দিক রূপায়িত করবার ভার পড়েছে সেইগুলি বেশ ভাল করে বুঝে আত্মস্থ করে নেন্। তারপর তাঁরা তাঁদের সাধ্যমত রূপ সৃষ্টি করেন। পরিচালক বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন শিল্পীর সেই খণ্ড খণ্ড রচনাগুলি এক সঙ্গে গেঁথে নেন; যতক্ষণে তাঁর পরিকল্পিত নাটকের সমগ্র রূপটী চোখের সামনে ধরা না দেয়···ততক্ষণ শিল্পীদের রচনাগুলির তিনি পুনঃপুনঃ সংস্কার করেন—তাদের বারম্বার নির্দ্দেশ দেন।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে পরিচালক নাট্যমঞ্চের প্রধান কর্ণধার। নাট্যকার, অভিনেতা, দৃশ্য-শিল্পী, সুর-শিল্পী, দীপদক্ষ প্রভৃতি প্রত্যেকেই তাঁর অধীনে থেকে তাঁর উপদেশ বা ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেন। শিল্পী-মনের একটী বিচিত্র ধর্ম্ম, নিজস্ব সৃষ্টির আনন্দে তাঁরা আত্মহারা হয়ে পড়েন। "আমার কল্পনা সবকিছুকে ছাড়িয়ে যাবে"—এই তো সব শিল্পীর নিত্যকালের কামনা। কিন্তু নাটমঞ্চ বিভিন্ন মনীষীর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নয়, দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িকের বিচার সভা নয়, অথবা মহারথীদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্থান নয়; নাট্যমঞ্চ হল, সমবেত সৃষ্টির মন্দির। এখানে যে রূপ-সৃষ্টি হয়, তাকে বলে Co-operative

creation ! তাই, আত্মহারা খেয়ালী শিল্পীদের সৃষ্টির মধ্যে সমতা (balance) রক্ষা প্রয়োজন, তাদের বিভিন্ন রচনাকে গ্রন্থিবদ্ধ করে নেওয়া প্রয়োজন। পরিচালক সেই সমতা রক্ষা করেন, তিনি বহুকে একীভূত করেন বা গ্রন্থিবদ্ধ করেন।

নাটকের ভূমিকা বণ্টনের সময় পরিচালককে বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে। কোন্ অভিনেতা বেশী মাইনে পাচ্ছেন, কে সবচেয়ে অধিক খ্যাতি অথবা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন—ভূমিকা বণ্টনের সময় এইগুলি পরিচালকের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। তাঁকে ভাবতে হবে—নাটকের বিশেষ বিশেষ চরিত্রের রূপ দিতে কোন্ কোন্ অভিনেতার চেহারা এবং কণ্ঠস্বর বা বাচনভঙ্গী সবচেয়ে বেশী উপযোগী হবে। আমাদের নাট্যমঞ্চে বহুক্ষেত্রেই কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। তরুণ নায়কের চরিত্রে প্রৌঢ় নটকে নির্ব্বাচন চিরাচরিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ প্রৌঢ় নটের পূর্ব্ব-খ্যাতি ও অভিজ্ঞতা আমাদের পরিচালকদের এমনই মোহগ্রস্ত করে রাখে যে, বাইরের থেকে চরিত্রোপযোগী সুন্দর তরুণ অভিনেতা নির্ব্বাচন করবার প্রচেষ্টা তাঁদের আর থাকে না। ফলে, নাটকও যথাযথ-ভাবে রূপায়িত হয় না, নূতন শিল্পীও গঠিত হয় না।

নাটকের মহলার (Rehearsal) সময় অভিনেতা কখন কোন্ কথাটার ওপর কীভাবে জোর দেবেন—পরিচালক তা ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন। কিন্তু সকলের বাচনভঙ্গী বা কোন কথার ওপর জোর দেবার ভঙ্গী ঠিক এক নয়। তাই পরিচালকের নিজের বলবার ভঙ্গীটী অভি-নেতাকে দিয়ে জোর করে আয়ত্ত্ব করিয়ে নেবার চেষ্টা অনেকস্থলেই পণ্ডশ্রম হয়। বক্তব্য বিষয়টী কীভাবে বলতে হবে—কোথায় কতটুকু

জোর দিতে হবে—পরিচালক অভিনেতাকে তাই বুঝিয়ে দেবেন এবং অভিনেতার নিজস্ব ভঙ্গীতে সেই কথাগুলো আদায় করে নেবেন। মহলার সময়, প্রয়োজন হলে, অভিনেতাকে দিয়ে বক্তব্যটা ঠিকভাবে বলাবার জন্যে নাটকের কথার সঙ্গে সাময়িকভাবে দু'চারটে কথাও যোগ করে দিতে হবে। যেমন, কোন অভিনেতাকে "আবার হাসছ" এই দুটীমাত্র কথার দ্বারা এই অর্থ বোঝাতে হবে যে "তোমার হাসি শুধু আমার অপমান করবার জন্যে। ওভাবে হাসলে তোমায় আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না—এক্ষুনি অপমানের চরম শিক্ষা দেব।" এই অর্থ বোঝাতে হলে "আবার হাসছ ? ফের ইতরের মত হাসলে এক ঘুঁসীতে তোমার দাঁত ভেঙ্গে দেব"—এমনি ধরণের কথা যোগ করে অভিনেতাকে দুই চারদিন মহলা দেওয়াতে হবে। কথা বিশ্লেষণ করে বাড়িয়ে দেবার দরুণ··অভিনেতার পক্ষে এইবার "আবার হাসছ" কথা দুটী ঠিকভাবে জোর দিয়ে বলা সহজ হবে। বলার ভঙ্গী তার আয়ত্ব হবার পর, বাড়তি লাইনগুলি কেটে দিয়ে—"আবার হাসছ" নাট্যকারের দেওয়া শুধু এই কথা দুটীকেই বলাতে হবে।

মঞ্চের কোন বড় অভিনেতা যেভাবে চলেন, যেভাবে কথা বলেন—নবাগত অভিনেতারা বহুক্ষেত্রেই তাঁদের হুবহু অনুকরণ করতে প্রয়াস পান। কিন্তু প্রত্যেকের বলার বা চলার ভঙ্গী আলাদা; তাই সে অনুকরণ ব্যর্থ হবেই। আর যদি বা বহুক্লেশে কারুর পক্ষে অনুকরণ করা অনেকখানি সম্ভব হয়···পরিচালক অভিনেতাকে তেমন অনুকরণ বৃত্তি হতে নিবৃত্ত করবেন। কারণ, মঞ্চে যে কথা বলে বা চলে—সে তো সেই লোকটী নয়; সে হ'ল নাটকের চরিত্র। চরিত্রের রূপদান করতে যে ধরণের চলা বা বলা প্রয়োজন, অভিনেতাকে, সেইভাবে চলতে বা বলতে হবে।

যাঁরা মঞ্চের অভিনয়ে খানিকটা খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন—তাঁরা অনেক সময় চান…"দর্শকের দৃষ্টি সব সময় আমার ওপর পড়ুক"—এইভাবে দাঁড়াতে। পক্ষান্তরে যাঁরা নবাগত—তাঁরা অনেক সময় দর্শকদৃষ্টির সামনে ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন এবং মঞ্চের এককোণে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরিচালকের এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যে চরিত্র যে দৃশ্যে, যে কাজের জন্যে এসেছে…সেই কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী পরিচালক অভিনেতাকে মঞ্চের ওপর দাঁড় করাবেন এবং ভীতত্রস্ত নবাগত যাতে ভয়ে পেছিয়ে না যায় কিম্বা "অতি অভিজ্ঞ" নট মাঝখানে বা সামনে এগিয়ে এসে চরিত্রের চেয়ে নিজের প্রাধান্য দেখাবার সুযোগ না পায়—সেদিকে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

নাটকের চরিত্রের মুখে যে কথা দেওয়া আছে, কোন কোন অভিনেতার তার চেয়ে দুএক লাইন বাড়িয়ে বলবার ঝোঁক দেখা যায়। অথচ তাঁরা ভুলে যান, যে নাট্যকার একখানা গোটা বই লিখলেন—দু'চারটে বাড়তি কথার প্রয়োজন থাকলে তিনি তা নিজেই বসিয়ে দিতে পারতেন। বিশেষ করে, নাটকখানি যখন পরিচালকের সন্ধানী দৃষ্টিতে পরীক্ষিত হয়ে মঞ্চস্থ হচ্ছে…তখন প্রয়োজন বুঝলে, পরিচালকও সে কথাগুলি যোগ করে দিতে পারতেন। নাটকের নির্দ্দিষ্ট সংলাপে একটী মাত্র শব্দ বাড়িয়ে নিলেও তাকে বলব, অভিনেতার ক্ষমতার দৈন্য। যেখানে যেটুকুন দেওয়া আছে তারই ভেতর থেকে একটা সমগ্র চরিত্রসৃষ্টি যাতে সম্ভব হয়—পরিচালক অভিনেতাকে সেইভাবে নির্দ্দেশ দেবেন।

অনেক সময় সুলিখিত নাটকও তেমন সাফল্য অর্জ্জন করতে পারে না—তার একটী প্রধান কারণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চরিত্রগুলির প্রতি

পরিচালক এবং অভিনেতা উভয়েরই অবহেলা। পরিচালকের অবহেলার দরুণ যাকে তাকে ছোট ভূমিকায় নামিয়ে দেওয়া হয়; আবার দক্ষ অভিনেতাকে তেমন ভূমিকায় নামালে তিনি চরিত্রটীকে যথোচিত রূপদানে তাচ্ছিল্য করেন; পরিচালকও অনেক ক্ষেত্রে সেই আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্য করেও বিশেষ কিছু বলেন না। কেবল এই দোষে বহু নাটক দর্শকের সমাদর লাভে বঞ্চিত হয়। মঞ্চে তারা চায় সমগ্রভাবে সুন্দরের প্রকাশ দেখতে—যে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকৃত হলে—দর্শক ক্ষুব্ধ হয়। সেই একটী বিকৃত অঙ্গ সমস্ত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ব্যর্থ করে দেয়।

চরিত্রের যথোচিত রূপদানে আবহ-সঙ্গীত অনেকস্থলে অভিনেতাকে সাহায্য করে। তরুণ তরুণীর লজ্জা-নম্র প্রথম মিলন লগ্নে, অথবা আসন্ন বিরহের ধূসর সন্ধ্যায়···দুটী বেপথুমান হৃদয়ের অন্তরালে অশ্রু-হাসির যে বাঁশরী বেজে ওঠে···তাকে যদি যন্ত্রসঙ্গীতের ভেতর দিয়ে জীবন্ত করে তোলা যায়···তাহলে অভিনেতা সেই চরম মুহূর্ত্তগুলির আলেখ্য নির্ম্মাণে যে কতখানি অনুপ্রেরণা পান—তা বলে শেষ করা যায় না। উপযুক্ত নাটকীয় পরিস্থিতি রূপায়ণে পরিচালক আবহ-সঙ্গীতের উপর অনেকখানি নির্ভর করতে পারেন। কারণ আবহ-সঙ্গীত দক্ষ অভিনেতাকে অনুপ্রেরণা দেয়; নবাগতের বহু ত্রুটী-বিচ্যুতি সুরের মায়াজাল রচনা করে দর্শকের দৃষ্টির আড়াল করে রাখে।

অভিনেতা, দৃশ্য রচনাকারী, সুরস্রষ্টা, আলোকশিল্পী প্রভৃতি সকলকেই পরিচালক তাঁদের কার্য্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেন। তা হ'লেই বোঝা যাচ্ছে, পরিচালকের সকল বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু একটী মানুষ সকল বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হতে পারেন না। তাই প্রত্যেক বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত আলোচনা ও

পরামর্শ করা প্রয়োজন। সব পরিচালক হয়তো মঞ্চের বিভিন্ন শিল্পীকে একথা বলতে পারেন না, "আমাকে এই জিনিষগুলি ঠিক এইভাবে করে দাও"; কিন্তু প্রত্যেক পরিচালকের এ কথাটা বলতে পারা উচিত, "আমি ঠিক এই ধরণের জিনিযগুলি চাই; যে ভাবে করতে হয়, তোমরা করে দাও"।

যখন সমবেত শিল্পীদের সহযোগিতায় পরিচালক নাটকের অখণ্ড মঞ্চরূপটী জীবন্ত হয়ে উঠেছে বুঝতে পারেন,—অভিনয়ে, সঙ্গীতে, আলোকে, সজ্জায়, সকল বিষয়ে নাটকের রূপ যখন সুসম্পূর্ণ হয়েছে মনে করেন—তখনই তিনি নাটককে দর্শকের সামনে রূপায়িত করবার অনুমতি দেন; তখনই নাটকের শুভ উদ্বোধন হয়।

মঞ্চাধ্যক্ষ ও স্মারক

মেশিন যখন চালু হয় অর্থাৎ নাটক যখন নিয়মিত অভিনীত হতে থাকে—সেই সময়টাতে পরিচালকের প্রতিনিধিত্ব করেন মঞ্চাধ্যক্ষ ও স্মারক (Stage manager and Prompter)। এঁরা দুজনেই মহলার সময় নিয়মিতভাবে উপস্থিত থেকে পরিচালকের ছোট, বড়···প্রত্যেকটী নির্দ্দেশ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেন এবং আবহসঙ্গীত, আলোক সম্পাত, নেপথ্য কোলাহল এবং প্রতি দৃশ্যে কোন্ কোন্ জিনিষ সাজিয়ে রাখতে হবে অথবা অভিনেতাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুতে হবে—সব কথা নাটকের পাণ্ডুলিপিতে এবং অন্যত্র লিখে নেন্।

স্মারকের ইঙ্গিতে নাটকের যবনিকা ওঠে নামে, অভিনয়কালে তিনি অভিনেতার প্রধান সহায়। অভিনেতাকে কথা ধরিয়ে দেবার সময় স্মারক সর্ব্বদা এই কথাটী মনে রাখবেন—তিনি নটনটীকে কথা যোগাচ্ছেন, নিজে অভিনয় কর্চ্ছেন না। তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু, সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে ভাবাবেগ বর্জ্জিত হওয়া উচিত। মঞ্চের ওপর থেকে অভিনেতা সেই নেপথ্যচারীর কাছে কথার যোগান পাবেন, মঞ্চে করণীয় কাজগুলি তাঁর মনে না থাকলে সেগুলির নির্দ্দেশ পাবেন (যা নাকি স্মারক পরিচালকের নির্দ্দেশরূপে পাণ্ডুলিপিতে টুকে রেখেছেন)। অভিনেতা নেপথ্যে তাঁকে দেখতে পাবেন, তাঁর কথা ও ইঙ্গিত বুঝতে পারবেন; কিন্তু দর্শকেরা তাঁকে দেখবেও না, শুনবেও না।

মহলার সময় স্মারক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করবেন—কোন, অভিনেতার অভিনয় ও বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য এবং ত্রুটী বিচ্যুতি কোথায়। স্মারক পূর্ব্ব হতে সেই বিষয়গুলিতে সতর্ক থাকলে—অভিনয়কালে অভিনেতাকে

আর কোন অসুবিধা বোধ করতে হয় না; স্মারক ঠিক সময়ে অভিনেতাকে ঠিক জায়গায় সতর্ক করে দেন।

স্মারকতা করতে হলে একটী বিষয় পুনঃপুনঃ চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ব করে নিতে হয়; সে বিষয়টী হল—কথা ধরিয়ে দেবার সময় বইএর দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ না রেখে অভিনেতার প্রতি লক্ষ্য রাখা। নির্দ্দিষ্ট পাতার নির্দ্দিষ্ট স্থানটীতে আঙ্গুল রেখে··মাত্র একমুহূর্ত্ত তাকিয়ে পরের লাইনটী দেখে নিয়েই আবার অভিনেতার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে··· তাকে কথা ধরিয়ে দিতে হবে। স্মারকের ঠোঁট নাড়া দেখতে পেলেও অভিনেতা অনেক সময় তাঁর বক্তব্য বুঝে নিতে পারেন, স্মারকের সামান্য ইঙ্গিতটুকু দেখতে পেলে তাঁর করণীয় কাজটুকু মনে পড়ে যায়। বিশেষতঃ নূতন অভিনেতা স্মারককে দেখতে না পেলে অনেক-খানি সাহস হারিয়ে ফেলেন। স্মারক নিজেও অভিনেতাকে দেখতে না পেলে···তিনি মঞ্চের ওপর কখন কি বিপদে পড়েছেন—কোন বিষয়ে সাহায্য চাইছেন তা জানতে পারেন না। দর্শকের উপস্থিতিতে অভিনেতা যে সাহায্য চান্—তাঁকে তা জানাতে হয় সামান্য চোখের ইঙ্গিতে, বা অতি সন্তর্পণে অঙ্গসঞ্চালন করে। তাই বলছিলুম, স্মারককে কাজ করতে হয় বেশীর ভাগ সময় বইএর দিকে না তাকিয়ে···অভিনেতার দিকে চোখ রেখে।

মঞ্চাধ্যক্ষ বা Stage managerএর দায়ীত্ব অতি কঠিন। আমাদের দেশে Stage managerএর কাজ হল: নটনটী সকলে এসে পৌঁছেছেন কিনা সেই সব খবর নেওয়া এবং দৃশ্যপট সাজানো হল কিনা যবনিকা ওঠবার আগে একবার মাত্র তার তদারক করা। এর বেশী কাজ আমাদের মঞ্চাধ্যক্ষেরা করেন না। প্রত্যেক দৃশ্যে যে যে

টুকিটাকি জিনিষ লাগবে তা সরবরাহ করবার ভার থাকে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, দায়ীত্ব বোধহীন অতি সাধারণ আর একটী লোকের উপর। তাকে বলা হয়—দ্রব্য সরবরাহকারক বা Requisition man. দৃশ্যের আসবাব পত্র সাজাবার পূর্ণ দায়ীত্ব অশিক্ষিত Shifterদের উপর এবং অভিনেতার সঙ্গে যে যে জিনিষ থাকবে—তা দেখে নেবার ভার আপন-ভোলা অভিনেতার উপর। অথচ, এই রকম প্রত্যেকটী ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবার দায়ীত্ব কিন্তু আর কারও নয়—একমাত্র মঞ্চাধ্যক্ষের।

ছায়াচিত্রের পরিচালক বহু পরিশ্রমে একখানি ছায়াছবি নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করলেন; যে মুহূর্ত্তে তাঁর সৃষ্টি ষ্টুডিও থেকে মুক্ত হয়ে রূপালী পর্দ্দায় প্রতিফলিত হল…সেই মুহূর্ত্ত হতে সেই চিত্রাভিনয় সম্বন্ধে কারও কোন দায়ীত্ব থাকলো না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ঠিক একই পরিবেষ্টনীর মধ্যে ছায়া-চরিত্রগুলি ঠিক একই ভাবে অভিনয় করে যাবে—আলোকে, সজ্জায়, সঙ্গীতে, ইঙ্গিতে…কোথাও পরিচালকের নির্দ্দেশ এক তিল ব্যতিক্রম হবার সম্ভাবনা থাকলো না। কিন্তু মঞ্চ-জগতে ছায়া নেই…এখানে কায়ার রাজত্ব। পদে পদে ভুল ভ্রান্তি এবং বাঁধা-ধরা পথ হতে ত্রুটি বিচ্যুতিই মানুষের স্বভাব-ধর্ম্ম। তাই মঞ্চ-জগতে এমন একজন সদা জাগ্রত প্রহরীর প্রয়োজন, যিনি প্রত্যেকটি ভুল ভ্রান্তি লক্ষ্য করে তা শুধ্রে দেবেন এবং মঞ্চ-রূপায়ণ সার্থক…সুন্দর করে তুলবেন। এই জাগ্রত নির্দ্দেশকারীর নাম Stage manager! আমাদের দেশে যত নাটক মঞ্চ-সাফল্য লাভ করেনি—তার জন্য অন্ততঃ পক্ষে অর্দ্ধেক দায়ী…দায়ীত্ববর্জ্জিত মঞ্চাধ্যক্ষ। একটু অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে, পরিচালক তাঁর শক্তি অনুযায়ী নাটককে মঞ্চরূপ দিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না; এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার মূল্য অল্প নয়। কিন্তু বেশীর ভাগ

নাটক দীর্ঘ আয়ূর সম্ভাবনা নিয়ে মঞ্চে প্রযুক্ত হলেও, কয়েক সপ্তাহ অভিনয় হতে না হতেই নানাদিক হতে অবহেলা ও অসাবধানতার পথ ধরে তার, মধ্যে অকাল-মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসে। এ অকাল মৃত্যুর জন্তে প্রধানতঃ দায়ী মঞ্চাধ্যক্ষ নিজে।

মঞ্চাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য, মহলার সময় পরিচালক নাটক সম্বন্ধে অভি-নেতাদের যে যে নির্দ্দেশ দিয়েছেন—তার প্রত্যেকটী খুটিনাটি মনে রাখা ; দৃশ্তের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং ছোটখাট জিনিষগুলির লিখিত তালিকা তৈরী করে নেওয়া ; প্রত্যেকবার যবনিকা ওঠবার সময় এবং পূর্ব্ব-দৃশ্য অভিনীত হবার সময়···পরবর্ত্তী দৃশ্তের সমস্ত জিনিষগুলি যথাস্থানে রাখা হয়েছে কিনা, তা নিজের চোখে দেখে নেওয়া। অভিনেতা যখন মঞ্চে প্রবেশ করবার জন্তে প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, অমনি তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন—"অমুক জিনিষটী নিয়েছেন ?" দৃশ্য শেষ হলেই অভিনেতার কাছ থেকে আবার জিনিষগুলি ফিরিয়ে নিতে হবে। নইলে, খেয়ালী অভিনেতার ভুলে জিনিষগুলি হারিয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। অভিনেতার স্মরণ, মনন যা কিছু···সবই চরিত্র সৃষ্টি নিয়ে। জিনিষপত্র চেয়ে নিতে বা ফেরৎ দিতে···তাঁর পদে পদে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। তাই, সে বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করবেন মঞ্চাধ্যক্ষ।

পরিচালক নাটকের যে পূর্ণাঙ্গরূপটী পরিকল্পনা করেন এবং প্রথম রাত্রির অভিনয়ে দর্শকের সামনে যে ভাবে তাকে উপস্থাপিত করেন—পরবর্ত্তী অভিনয়ে কোন দিন, কোন একমুহূর্ত্তের জন্যও সেই পূর্ণাঙ্গরূপটী কোথাও এতটুকু পরিম্লান না হয়—সে দায়ীত্ব মঞ্চাধ্যক্ষের। তিনি পরিচালকের প্রতিনিধি ; অভিনয়ের, আলোকসম্পাতের, দৃশ্যসজ্জার,

আবহসঙ্গীতের···কোন ক্ষুদ্র ত্রুটীও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যাবেনা। এমন কি, প্রয়োজন হলে, তিনি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও সঙ্কুচিত হবেন না। তাই কর্তৃপক্ষেরও উচিত, অভিনয়কালে মঞ্চাধ্যক্ষকে সর্ব্ববিভাগের শিল্পীর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দান করা।

মঞ্চ-শিল্পের সাফল্য সমস্ত শিল্পীর সমবেত সাধনার ওপর নির্ভর করে; একটীমাত্র শিল্পীর সামান্য ত্রুটীও সকলের সম্মিলিত প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। প্রতি অভিনয় রাত্রে যা'তে কোথাও কারো এতটুকু ত্রুটী না হয়, সামান্য ভুলে নাট্য-রস সৃষ্টির প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ না হয়—এইজন্যই সদা-সতর্ক মঞ্চাধ্যক্ষের একান্ত প্রয়োজন।

অভিনেতা

নাট্যকার চরিত্র সৃষ্টি করেন; বইএর পাতার সেই চরিত্র কেমন করে মঞ্চে রূপ নেবে, সে বিষয় পরিকল্পনা করেন এবং নির্দ্দেশ দেন পরিচালক; অভিনেতার কাজ হ'ল, চরিত্রকে দর্শকের চোখের সামনে মঞ্চে জীবন্ত ভাবে রূপায়িত করা। অভিনেতা চরিত্রকে জীবন্ত করেন কথায়, ভাবব্যঞ্জনায়, অঙ্গভঙ্গীতে এবং কার্য্যে।

দর্শক না থাকলে রঙ্গমঞ্চ চলে না; দর্শকের জন্যেই নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা এবং মঞ্চ-সংশ্লিষ্ট সমস্ত শিল্পী। দর্শক, নাটকের চরিত্রগুলিকে চোখে দেখতে আসেন, তাদের কথা কানে শুনতে চান্। তাই অভিনেতার প্রথমতম কর্ত্তব্য হল—কথা এমন স্পষ্টভাবে বলা, যাতে নিম্নতম শ্রেণীর দর্শকেরাও তা শুনতে পান। কথাকে সুস্পষ্ট করতে হলে, কি ভাবে এবং কখন শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়—সবার আগে প্রয়োজন সেই কৌশলটী আয়ত্ত্ব করা।

নূতন অভিনেতাদের প্রধান দোষ, ছোট ছোট কথাগুলিকে অবহেলা করা। অথচ সেই ছোট কথা বা কথার ভগ্নাংশগুলিকে যদি পূর্ণ মর্য্যাদা দেওয়া যায়—তা হলে বড় কথাগুলি আপনিই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনেকে পূরো দম নিয়ে অভিনয় আরম্ভ করলেও কথার একেবার শেষ দিকটা অস্পষ্ট করে ফেলেন; আবার কেউ কেউ কথা ধরবার মুখে এমন তাড়াহুড়ো করে বলেন···যাতে সংলাপ মাঝামাঝি যায়গায় না আসা পর্য্যন্ত তিনি যে এতক্ষণ কথা বলছিলেন, দর্শকেরা তা বুঝতেই পারেন না। এক নিঃশ্বাস বেশী কথা বলার ফলেই এই অস্পষ্টতা। যথাযথ-ভাবে বাক্যাংশ ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেক বাক্যাংশ বলবার সময় নূতন নিঃশ্বাস নিয়ে এমন ভাবে কথা বলা অভ্যাস করতে হয়—যেন

কথার মানে কোথাও পাল্টে না যায়—অথচ প্রত্যেকটী বাক্যাংশ বলার পরও খানিকটা নিঃশ্বাস অবশিষ্ট থাকে।

খুব চেঁচিয়ে কথা বললেই যে লোকে তা সব সময় শুনতে পারবে, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কথা স্পষ্ট ও শ্রোতব্য হয়—শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের কৌশল অনুযায়ী। অভিনেতার নিঃশ্বাস যে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করে, সেই তরঙ্গই কথাকে দূর দূরান্তরে বহন করে নেয়। সুতরাং খুব চেঁচিয়ে কথা বললেও তা বহু দূরে পৌঁছুতে পারে না—যদি না তাকে বহন করে নেবার জন্যে···সঙ্গে থাকে—বক্তার সুনিয়ন্ত্রিত শ্বাস-প্রশ্বাস। এই নিয়ন্ত্রণ কৌশলটী যিনি আয়ত্ব করতে পারেন, তিনি অতি মৃদুস্বরে কথা বললেও বায়ু-তরঙ্গে ভেসে সে কথা যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছুবেই।

নবাগত অভিনেতাদের একটী প্রধান দোষ মঞ্চের নায়ক বা "হিরো" অভিনেতার বাচনভঙ্গী, এমন কি কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত হুবহু অনুকরণ করবার প্রচেষ্টা। প্রত্যেক চরিত্রের বাচনভঙ্গী স্বতন্ত্র। এমন কি, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একই চরিত্রের বাচন ভঙ্গীও বিভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত। যে পরিস্থিতিতে যে চরিত্র···যে প্রকার মনোভাব প্রকাশ করতে চান—তাঁর বাচন ভঙ্গীও তদনুযায়ী রূপান্তর গ্রহণ করবে। উদাহরণ স্বরূপ মিস্ জেনে ভাইভ্ ওয়ার্ডের (Miss Genevieve Ward) একটী বিখ্যাত একাঙ্কিকা থেকে সারাংশ উদ্ধার করে দিচ্ছি। নবাগতা অভিনেত্রী···"এদিকে এস"···মাত্র এইদুটী কথার সাহায্যে বিভিন্ন মনোভাব কেমন প্রকাশ করতে পারেন—থিয়েটারের ম্যানেজার তাই পরীক্ষা কর্চ্ছেন।

ম্যানেজার। মনে মনে কল্পনা করো···মায়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে···

প্রেমিক প্রেমিকা ;—তারা চায় তাঁর কাছে আসন্ন-মিলনের সম্মতি। নায়ক অতি দরিদ্র, কিন্তু নায়িকার মাতা আভিজাত্য গর্ব্বিতা ; এ মিলন প্রার্থনা তাঁর মনে দারুণ সঙ্ঘর্ষ ঘটালো। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু···তিনি ওদের দু'বাহু বাড়িয়ে ডাকলেন—

অভিনেত্রী। এদিকে এসো।

ম্যানেজার। ছোট্ট মেয়েটা এমন একটা কাজ করে ফেলেছে যাতে মায়ের বিরক্তির অবধি নেই। তিনি ডাকলেন—

অভিনেত্রী। এদিকে এসো।

ম্যানেজার। ঐ মেয়েটী যদি তাঁর সপত্নী-কন্যা হয়···তাহলে বলতেন—

অভিনেত্রী। এ দিকে এসো।

ম্যানেজার। ছোট মেয়েটী রাস্তায় গেছে, ঠিক সেই সময় খুব জোরে একখানি গাড়ী আস্ছে। মায়ের বুক ভয়ে কেঁপে উঠল। তিনি ডাকলেন—

অভিনেত্রী। এদিকে এসো।

ম্যানেজার। দেশের জন্য সংগ্রাম করতে গেছেন গৃহস্বামী। স্বদেশ তাঁকে চেয়েছে ; তাই চোখের জলে ভেসে তাঁকে বিদায় দিতে হয়েছে। আজ শূন্য গৃহে, নিরানন্দ সংসারে, একমাত্র সান্ত্বনা তাঁর সন্তানগুলি। সেই সন্তানদের বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরেন ; তাদের ডেকে বলেন—

অভিনেত্রী। এদিকে এসো।



নরেশচন্দ্র মিত্র



ছবি বিশ্বাস



শ্রীমতী সরযূবালা



শ্রীমতী রাণীবালা

ম্যানেজার। যুদ্ধ জয় করে অবশেষে বিজয়ী যোদ্ধা গৃহে ফিরে আসছেন। দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়েই, আনন্দ-ব্যাকুল-কণ্ঠে ছেলে মেয়েদের ডাকলেন—

অভিনেত্রী। এদিকে এসো।

ম্যানেজার। দীর্ঘ অদর্শনের পর আজ বিজয়ী স্বামীর সঙ্গে প্রথম মিলন। এ আনন্দের অংশ তিনি আজ আশে পাশে যারা আছে, সবাইকে বিলিয়ে দিতে চান্। তাই স্বামীর বিশ্বস্ত ভৃত্যটীর প্রতি চোখ পড়তেই তাকে ডাকলেন—

অভিনেত্রী। এদিকে এসো।

ম্যানেজার। আগুন লেগে যথাসর্ব্বস্ব পুড়ে গেছে। পোড়াবাড়ীর দরজায় পাওনাদারেরা এসে ভীড় জমিয়েছে। ওদের চীৎকার শুনে উঠে দাঁড়াল অনাথা বিধবা; তার স্বামীর অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ এখনো সামনে পড়ে। ওদের বর্ব্বর নিষ্ঠুরতাই—এই অভাগিনীর স্বামীর মৃত্যুর কারণ। কিন্তু তবু এখনো ওদের পৈশাচিক অত্যাচার ক্ষান্ত হ'ল না! এখনো বলে, "আমাদের টাকা দাও!" মেয়েটী জবাবে, এখন তার যা শেষ সম্বল, তার স্বামীর সেই মৃতদেহটী দেখিয়ে দিল;—ওদের নিষ্ঠুরতা কেমন চরম সীমায় পৌঁছেছে তাই দেখিয়ে বলল—

অভিনেত্রী। এদিকে এসো।

সামান্ত দুটী শব্দ···বাচনভঙ্গীর তারতম্য অনুসারে কত বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে···একাঙ্কিকার উল্লিখিত অংশ তার চমৎকার উদাহরণ।

নিজের ভূমিকা অভ্যাস করবার সঙ্গে সঙ্গে খুব ভালভাবে মনে করে রাখা দরকার—অপরের কথার সূত্র (Cue) আয়ত্ত্ব না থাকলে ঠিক যে মুহূর্ত্তে যে কথাটী বলা দরকার—তা সময় মত বলা হয়ে ওঠে না; তার ফলে অভিনয়ের গতি অত্যন্ত মন্থর হয়ে পড়ে। মঞ্চাভিনয়ের দ্রুতগতি মানে দ্রুত কথা বলা নয়—কথার সূত্রগুলি খুব তাড়াতাড়ি ধরে নেওয়া।

অভিনয় কালে প্রতি দৃশ্যে যে কয়জন অভিনেতা মঞ্চে উপস্থিত থাকেন তাঁদের সর্ব্বক্ষণ কথা বলতে হবে। নাট্যকার যে চরিত্রের মুখে যখন কোনো কথা দেননি—তাঁকেও তখন কথা বলতে হবে···চোখের সাহায্যে, তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভেতর দিয়ে···ভাবাভিব্যক্তির দ্বারা। একটী চরিত্র যখন কোন কিছু বলছে, অন্য চরিত্র হবে তখন তার শ্রোতা। শ্রোতা যখন মুখে কথা বলে না—সে তখন মনে মনে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। সেই মনের ক্রিয়াকেই তখন বাইরে ব্যক্ত করতে হবে, নির্ব্বাক অভিনয়ে।

কোন কোন অভিনেতার স্বভাব···অভিনয়ের সময় দর্শকের দিকে তাকানো···এমন কি তাদের সম্বোধন করে এক আধটা কথা বলা। এ অভ্যাস অত্যন্ত নিন্দনীয়। অভিনয়ের সময় ভুলে যেতে হবে—সামনে দর্শক বসে রয়েছে। অভিনয়ের এক একটী দৃশ্য···সে যেন নাটমঞ্চের ফ্রেমে বাঁধানো এক একটী জীবন্ত-চিত্র। দর্শকের সঙ্গে সবাক অথবা নির্ব্বাক কথা বলা মানে—ফ্রেমের বাইরে এসে দাঁড়ানো; তার মানে—গোটা ছবিখানিকে নষ্ট করে দেওয়া।

আর একটী বিশেষ দরকারী কথা স্মরণ রাখতে হবে; বিয়োগান্ত

চরিত্র ফুটিয়ে তোলবার জন্য করুণ রস সৃষ্টির "প্রচেষ্টা" অভিনেতার সব সময় ত্যাগ করা উচিত। নাটকের চরিত্রের ভেতর যদি সত্যিই করুণ রস থাকে—তা অতি সহজে স্বাভাবিক ভাবে আপনিই প্রকাশ পাবে। তাকে চেষ্টা করে বাইরে আনবার কোনো প্রয়োজন হয় না। সংযত, ইঙ্গিতপূর্ণ অভিনয়ে···নাটকের অন্তর্নিহিত কারুণ্য যেমন করে দর্শককে অভিভূত করে··তেমন আর কিছুতে নয়। নিজে চোখের জল ফেলে, বুক চাপড়ে হা-হুতাশ করে রসিক দর্শককে কাঁদানো যায় না; উল্টে বরং হাস্যরসেরই উদ্রেক হয়। কমেডি বা মিলনান্ত নাটকের বেলায়ও এই কথাই খাটে। যে চরিত্রে আনন্দের উচ্ছ্বাস বা হাসির ব্যাপার রয়েছে—তা আপনা হতেই দর্শককে হাসিয়ে অস্থির করবে। জোর করে হাসাবার চেষ্টাকে অভিনয় বলে না, তাকে বলে ভাঁড়ামো।

আগেই বলেছি, নাট্যাভিনয় Co-operative Creation—সমবেত সৃষ্টি। নাট্যকার, পরিচালক, নটনটী, সুরশিল্পী, দৃশ্যশিল্পী, আলোকদক্ষ প্রভৃতি সবাই মিলে অভিনয়কে সফল করে তোলেন। নাটকের প্রতিটী চরিত্র রূপায়ণে, প্রত্যেক নটনটীর পরস্পরের কথা ও কার্য্যের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলা দরকার। কোন দৃশ্য···কোন একটী একক চরিত্রের নয়; একাধিক চরিত্রের কার্য্যকলাপ দ্বারাই দৃশ্য সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। তাই সত্যিকারের অভিনেতা বলব তাঁকে—যিনি তাঁর একার জন্য অভিনয় করেন না; অভিনয় করেন নাটকের সমস্ত নটনটীর সঙ্গে মিলিত হয়ে···সমগ্রভাবে রসসৃষ্টির জন্য। অভিনেতা কখনও একক নন; তিনি তাঁর মঞ্চের সমগ্র অভিনেতৃগোষ্ঠীর।

অভিনয়ের রূপ

Coquelin ও Elsie Fegertyএর কথা

এক জাপানী অভিনেতার সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। একদিন তিনি দেখলেন...যে, তাঁর ছেলে এক বুড়ীর পিছু পিছু যাচ্ছে তার চলাফেরা অনুকরণ করতে। ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে, তিনি জানতে পারলেন, যে, তাঁর ছেলেটীর ইচ্ছা হয়েছে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের ভূমিকা অভিনয় করে যশ অর্জ্জন করবে; তাই সে বুড়ীর হাবভাব, চলাফেরা অমনি করে অনুকরণ কর্চ্ছিল। একথা শুনে তার বাপ অর্থাৎ সেই অভিনেতা ছেলেকে বললেন: "এভাবে তুমি সারাজীবন চেষ্টা করেও অভিনেতা হতে পারবে না। তোমার মনের ভেতর দৃঢ় বিশ্বাস আনতে হবে যে তুমি বুড়ো হয়েছ; তা হলেই দেখবে বাইরের হাবভাব, চলাফেরা আপনা হতেই বুড়োদের মত হয়েছে।" জাপানী অভিনেতার এই উপদেশ খুবই মূল্যবান। অভিনেতার প্রধান কর্ত্তব্য হল...একান্ত ভাবে চরিত্রের ধ্যান ধারণা; মনের ভেতর রূপটী বসে গেলে—বাইরে তার প্রকাশ হয়—স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

নাট্যকারের মত অভিনেতাও জন্মায়—তৈরী হয় না। অভিনয় কারুকে শেখানো যায় না; এ বিদ্যার সৃষ্টি হয় অভিনেতার মনে। কিন্তু মনের ভেতর এই জ্ঞান আছে...কি নেই—প্রতিভা যতক্ষণ নাটমঞ্চে পরীক্ষিত না হচ্ছে...ততক্ষণ কেউ তা বুঝতে পারে না। জন্মগত প্রতিভারও সংস্কার সাধন প্রয়োজন। শুধু ইস্পাত কাজে লাগে না; তাকে গড়ে পিটে অস্ত্র তৈরী করে নিতে হয়; সে অস্ত্রকেও আবার মাঝে মাঝে শাণিয়ে নেওয়া দরকার। তবেই তো ইস্পাত কাজের উপযোগী হবে! অভিনেতারও শিক্ষা প্রয়োজন।

প্রথম শিক্ষার্থীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদের ইচ্ছানুযায়ী চালিত হয় না, তাদের কণ্ঠস্বরকে তারা ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। এই নিয়ন্ত্রণ কৌশলটী সর্ব্বাগ্রে আয়ত্ব করা প্রয়োজন। কণ্ঠ ও আঙ্গিক অভিব্যক্তি আয়ত্বে এলে···তাতে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে হবে। আর, ইতিমধ্যে আর একটী জিনিয যা শিখে নেওয়া দরকার—সে হ'ল অভিনয় নৈপুণ্যের একেবারে গোড়ার কথা—বিভ্রম (illusion) রচনা কৌশল। অভিনয় কলাকে বলা হয়—Art of "make believe". অভিনেতা যখন যে চরিত্রে রূপদান কর্চ্ছেন, দর্শকের মনে বিশ্বাস জন্মাতে হবে—তিনি যেন সত্যিই সেই চরিত্র; তিনি যা কর্চ্ছেন, যা বলছেন, সবই যেন সত্যি; তার ভেতর কোথাও এতটুকু মিথ্যার ছায়ামাত্র নেই।

অভিনয় বিদ্যা কি? কি তার রূপ? অভিনয় বলব সেই কলাবিদ্যাকে—যা নাকি মানুষের সমস্ত সত্ত্বাকে এমন এক কল্পলোকে নিয়ে যায়··· যেখানে মানুষের জীবন তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নব নব রূপ গ্রহণ করে। বাস্তব জীবনে মানুষের ইচ্ছা, মানুষের বাসনা কামনা কখনও স্বাধীন নয়; অভিনেতার রচিত কল্পলোকে তার ইচ্ছাশক্তি অবারিত, সেখানে সে নিজের স্রষ্টা। অভিনয় কালে নিজেকে নূতন ভাবে সৃষ্টি করবার সুযোগ রয়েছে···আনন্দ রয়েছে···তাই মানুষ মঞ্চের পানে এমন আকৃষ্ট হয়।

(২)

আর্ট বা শিল্পকলা জিনিষটী কি? আর্ট বলি আমরা কবি-কল্পনা ও মহত্তর সত্যের সংমিশ্রণকে। মহত্তর সত্যকে কল্পনার প্রসাধনে সাজিয়ে

প্রকাশ করবার নামই আর্ট। চিত্রকর এ কাজটী করেন ক্যানভাসের ওপর রঙের তুলি বুলিয়ে, কবি তাঁর বাক্য ও সঙ্গীত দিয়ে, স্থপতি··· মাটী আর যন্ত্রপাতি দিয়ে। যে ধরণের যন্ত্র বা উপাদানের সাহায্যে শিল্পী তাঁর শিল্পকলা প্রকাশ করেন, সেই অনুযায়ী, শিল্পকলা বা আর্ট বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। অভিনেতার শিল্পকলা প্রকাশের উপাদান এবং যন্ত্র—অভিনেতা নিজে। তাঁর দেহ, তাঁর জীবন তাঁর শিল্পকার্য্যের উপাদান; নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে নিজের সত্ত্বা দিয়ে তিনি যা গড়ে তোলেন—সেই হল তাঁর শিল্প-সৃষ্টি।

প্রত্যেক অভিনেতার মধ্যে দুটী মানুষ রয়েছে; একটীকে বলা যায় যন্ত্রী···অপরটীকে যন্ত্র। একজন সুরের পরিকল্পনা করে, আর একজনের সাহায্যে তাকে ঝঙ্কৃত করে তোলেন।···প্রথম মানুষটী চরিত্র পরিকল্পনা করেন অথবা নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রের সমগ্ররূপটী কল্পনা করেন; দ্বিতীয় মানুষটী নিজে উপাদান হয়ে সেই কল্পনা নিজের মধ্যে রূপায়িত করে তোলেন।

চিত্রকর ছবি আঁকবার আগে সামনে একটী মাডেল রাখেন···অথবা মনে মনে একটী মডেল সৃষ্টি করেন। সেই মডেলের প্রতিটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেমন, তার দেহের কোথায় কোন রেখাটী কেমন ভাবে রয়েছে··· সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে·· তারপর তুলির সাহায্যে ক্যানভাসের ওপর তার প্রতিরূপ অঙ্কণ করেন। অভিনেতার ভেতরকার "প্রথম মানুষটী" আগে অমনি করে মডেলটীকে ধীরে ধীরে কল্পনা করেন। মডেলের পরিকল্পনা···ছোটখাট প্রত্যেক বিষয়ে যাতে নিখুঁত হয়—সে জন্যে বার বার করে তিনি নাট্যকারের তৈরী চরিত্রটী পাঠ করেন; চরিত্রের প্রত্যেকটী কাজ, প্রতিটী কথা···মনে মনে বিশ্লেষণ

করেন। এমনি ভাবে নানাদিক থেকে তাকে পর্য্যবেক্ষণ করে—একেবারে সম্পূর্ণভাবে তাকে যখন আয়ত্বের মধ্যে আনতে পারেন—তখনই তাঁর মডেল পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়। এইবার "দ্বিতীয় মানুষটীকে" তিনি সেই মডেলটী দিয়ে বলেন, "নিজেকে ঠিক এইভাবে রূপান্তরিত করো।" দ্বিতীয় মানুষটী তখন নিজের মুখ, নিজের শরীর, নিজের সমস্ত সত্ত্বাকে নানাভাবে পরিবর্ত্তিত করে, নিয়ন্ত্রিত করে সেই মডেল অনুযায়ী নিজেকে সৃষ্টি করেন। ভাস্কর যেমন করে পাথর কেটে পরিকল্পিত মূর্ত্তি গড়ে তোলেন—"দ্বিতীয় মানুষটীও" তেমনি করে নিজের দেহের ভেতর থেকে "প্রথম মানুষটীর" ইচ্ছানুযায়ী আর একটী মূর্ত্তি গড়ে তোলেন। স্থপতি ও চিত্রকরের তৈরী মূর্ত্তি কথা বলে না; "দ্বিতীয় মানুষটীর" তৈরী মূর্ত্তিকে কথা বলতে হয়; এমনভাবে বলতে হয়, যেন সে স্বর, সে বাচনভঙ্গী সেই নবসৃষ্ট মূর্ত্তি বা চরিত্রটীর। এই জীবন্ত চরিত্রটী মঞ্চের ফ্রেমে বাঁধানো জীবন্ত ছবি। তাঁকে এমনভাবে ঠিক মডেল অনুযায়ী হতে হবে···যেন তাঁকে মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখে দর্শক কখনও না বলতে পারে—"অমুক অভিনেতা এলেন"; দর্শক বলবে, "Hamlet এলেন···Macbeth এলেন···শাজাহান এলেন··· রামচন্দ্র এলেন।" এ না হ'লে অভিনেতার সমস্ত প্রচেষ্টাকে বলব—নিস্ফল।

অভিনেতার মনে এই দুটী মানুষ অবিচ্ছিন্নভাবে বাস করে; এদের কারুকে আলাদা করা যায় না। তা'হলেও "প্রথম মানুষটী"র অধীনে থাকে "দ্বিতীয় মানুষ"। প্রথমকে বলা চলে—আত্মা; দ্বিতীয়কে—দেহ। আত্মার অনুশাসন মেনে দেহকে সর্ব্বদা চলতে হয়। যাঁর দেহ আত্মার ইচ্ছানুযায়ী যতখানি নিয়ন্ত্রিত হয়···তিনি অভিনেতাও হন তত উচ্চস্তরের। সুতরাং অভিনেতার দেহ হওয়া চাই ইস্পাতের মত নমনীয়।

প্রয়োজন হলে তাকে যেভাবে খুসী মোমের মত গালিয়ে নিয়ে কোন চরিত্রের ছাঁচে ফেলে নূতনভাবে তৈরী করে নেওয়া যাবে।

কিন্তু তা বলে একথাটা ভুললে চলবে না যে—নাট্যকারের রচিত চরিত্রটার ভেতরকার সত্যিকারের রূপ অনুধাবন করাই অভিনেতার সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য। অবিশ্যি চরিত্রের বহিরাকৃতির রূপ দর্শককে যথেষ্ট আনন্দ দেয়। কিন্তু চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ না করে শুধু বাইরের ছবিটা নিয়ে যাঁরা মেতে ওঠেন—তাঁদের কখনও উচ্চাঙ্গের অভিনেতা বলা চলে না। অভিনয়ের একেবারে গোড়ার কথাটাই হল চরিত্র-অঙ্কণ বা চরিত্র সৃষ্টি। চরিত্রের মূল সুরটা কি···তা ধরতে পারলেই অভিনেতার বেশীর ভাগ কাজ শেষ হয়ে গেল। বাইরের রূপ মনের রূপ থেকে সৃষ্টি হয়। আত্মাই দেহকে সৃষ্টি করেন, দেহ আত্মাকে নয়।

সুস্পষ্ট উচ্চারণ প্রত্যেক অভিনেতার শিক্ষা করা উচিত। আজকাল স্বাভাবিক অভিনয় (Natural Acting) এর দোহাই দেওয়া হচ্ছে; তাই খাবার সময়, ট্রামে বাস্‌এ যাবার সময়, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করবার সময়, আমরা যে ভাবে কথা বলি—মঞ্চেও ঠিক সেই ভাবে অভিনয় করবার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, যে—নাটমঞ্চ কারুর বাড়ীর ড্রইং রুম নয়; দু'চারজন বন্ধুর সঙ্গে যেভাবে আলোচনা করা যায়—হাজার দর্শকের সামনে ঠিক সেভাবে কথা বলা চলে না। আওয়াজ জোর না হলে দর্শকেরা শুনতে পাবে না; উচ্চারণ সুস্পষ্ট না হলে তারা বুঝতে পারবে না। অভিনয়কালে নাটকের কাহিনীই দর্শককে সব চেয়ে বেশী আগ্রহশীল করে; কাহিনী অনুসরণ করতে না পারলে দর্শক ক্ষুণ্ণ হবেই। সুতরাং কথা হবে

সুস্পষ্ট এবং উচ্চ; যে বাক্যে বা যে কথায় যতটুকু জোর দিতে হবে বা প্রাধান্য আরোপ করতে হবে—অভিনেতাকে তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

চরিত্রের বাইরের রূপটি ফুটিয়ে তুলতে অভিনেতা যেটুকু পরিশ্রম করেন, তার চেয়ে ঢের বেশী শ্রম-সাধ্য কাজ কণ্ঠস্বরকে আয়ত্বাধীন করা। অভিনেতার ভেতরকার "দ্বিতীয় মানুষটাকে" কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য সাধনের জন্য কঠোর সাধনা করতে হয়। চরিত্রের তারতম্য অনুযায়ী কণ্ঠস্বরের বিবিধ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রেমিকের প্রেম নিবেদন এবং বিচারকের দণ্ডাজ্ঞা জ্ঞাপন ঠিক এক রকম কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পায় না। প্রফুল্ল নাটকের যোগেশ, রমেশ এবং সুরেশ ঠিক একভাবে কথা বলেনা; কারণ তাদের চরিত্রের পার্থক্য···তাদের ভিন্ন ভাবে কথা বলায়।

ভাবাভিব্যক্তির দিক দিয়ে অভিনেতার চোখ সব চেয়ে বেশী কাজ করে। দর্শক অভিনেতার চোখের দিকে লক্ষ্য করেন; চোখের ভাষা পাঠ করতে চান্। দৃষ্টি যদি অকারণ ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হয় কিম্বা তাতে যদি কোনো অভিব্যক্তি না থাকে, নাটকের চরিত্র যা বলছে বা যে কাজ কর্চ্ছে···দৃষ্টি যদি তার অনুযায়ী না হয়—তাহলে দর্শকেরা রস উপলব্ধি করতে পারেন না। অভিনেতাকে অন্যমনস্ক ভেবে তাঁরাও বিরক্তি বোধ করেন। উদাহরণ স্বরূপ, নাটকের কোন ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্ণনা করবার সময় অভিনেতার চোখের দৃষ্টিও এমন হওয়া প্রয়োজন···যেন বর্ণিত কাহিনীটী তিনি চোখের সামনে ঘটতে দেখছেন। দর্শক, অভিনেতার চোখে সেই বর্ণিত কাহিনীটী

প্রতিফলিত দেখতে পাবেন। যিনি বর্ণনা কর্চ্ছেন তাঁর দৃষ্টি যেন একটী বিন্দুতে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল; তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দর্শকের মনে হল···যেন বর্ণিত ঘটনার কেন্দ্র স্থলে তিনি তাকিয়ে আছেন—সেখানে সব ঘটনা পর পর দেখতে পাচ্ছেন! শুধু বর্ণনাকারী নয়, পার্শ্ববর্ত্তী যে অভিনেতাকে সেই কাহিনী শোনান হচ্ছে···তাঁরও দৃষ্টি বর্ণনাকারীর দৃষ্টিকে অনুসরণ করা উচিত। তিনিও যেন ঘটনাটী নিজের চোখে দেখছেন। নইলে তাঁর অন্যমনস্কতা দর্শককে ঘটনার গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্ধীহান করে তুলবে। অবশ্য এটা একটা উদাহরণ মাত্র; কাহিনী বর্ণনা এবং শ্রবণ করা নানাভাবেই চলতে পারে। অনেক সময় শ্রবণকারীর বাইরের ঔদাসীন্যও দর্শককে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে তিনি খুব মনোযোগের সঙ্গে কথাগুলি শুনছেন। অর্থহীন দৃষ্টিতে শূন্যপানে তাকিয়ে অথবা বই পড়বার ছল করেও—অনেক কথা শুনে নেওয়া যায়। মোট কথা এই, অভিনেতার দৃষ্টি সর্ব্বদা নাটকের কাজের অংশ নেবে। শূন্য-দৃষ্টিতে তাকিয়েই হোক—বা চঞ্চল অথবা আগ্রহশীল রূপেই হোক—অভিনেতার চোখ দুটী যেন সর্ব্বদা নাটকীয় ক্রিয়াকে সাহায্য করে।

আর্ট বা শিল্পকলার কাজ প্রতি-রূপ রচনা করা। অন্যকে কাঁদাতে হলে নিজেকেও কাঁদতে হবে—অভিনেতার বেলা এ কথা খাটে না। এমনও হতে পারে, অভিনেতা সত্যিসত্যি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লে, দর্শকেরা তার চেয়েও জোরে হেসে উঠ্‌বেন। অভিনেতা নিজে থাকবেন সমস্ত প্রকার ভাবপ্রবণতার উর্দ্ধে; জলে ভাসা তেলের মত। অভিনয় করতে করতে অভিনেতা নিজেই যদি ভাবাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন—নিজের মনের ওপর নিজের প্রভুত্ব হারিয়ে ফেলেন—তা হলে তাঁর পক্ষে চরিত্র রূপায়ণ সম্ভব হতে পারে না। এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর

কথা আছে। ও দেশের একজন বড় অভিনেত্রী এক সময় বলেছিলেন—"অভিনয় করবার সময় অভিনেতা যে জিনিষটী নিজে সত্যিসত্যি অনুভব না করে—তেমন কিছু সে তার কার্য্যে প্রকাশ করতে পারে না।" একথা শুনে এক তরুণী প্রশ্ন করেছিল—"রঙ্গমঞ্চে যখন আপনারা মৃত্যুর অভিনয় করেন·· তখন?..."

অভিনয় কখনো সম্পূর্ণ বাস্তব হতে পারে না, কারণ অভিনয় শিল্পকলারই অঙ্গীভূত। মঞ্চে বাস্তব-জীবন রূপ নেবে, কাব্যের সুরভি নিঃশ্বাস বায়ুতে, দেখবে সে আদর্শের স্বপ্ন। নিছক বাস্তবের অনুসরণ করা অভিনেতার পক্ষে মহা অন্যায়।

স্বভাব বা প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে কোন শিল্পকলা গড়ে উঠতে পারে না,—তেমনি শিল্প-সৌন্দর্য্যকে বাদ দিয়ে রঙ্গমঞ্চে স্বাভাবিকের বা প্রাকৃতিকের কোন স্থান নেই। রঙ্গমঞ্চের প্রতিটী জিনিষ সত্য হ'তে উদ্ভূত হবে; গতি হবে তার আদর্শের পানে। কমেডি (Comedy) নাটক মানুষের ভুল, ত্রুটী, অন্যায়, অপরাধ সব কিছুর ওপর আলোক সম্পাত করে দর্শকগণকে আদর্শের পানে নিয়ে যায়। এই ভুল ত্রুটীগুলি চোখের সামনে বড় করে ধরা হয়·· হাস্য-পরিহাস, ব্যঙ্গ-কৌতুকের ভেতর দিয়ে। এই হাস্য পরিহাসের অবতারণা না করে যদি পাপের নগ্ন, বিভৎস রূপ চোখের সামনে বাস্তব আকারে ধরা হ'ত · তা হলে নাটক সৃষ্টি হত না।

বিখ্যাত অভিনেতা C. Coquelin এক সময় অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহে, ঘুমের দৃশ্য অভিনয় করতে গিয়ে মঞ্চের ওপর সত্যিসত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; সারা শরীর ভেঙ্গে তাঁর এমন ঘুম এসেছিল যে

নাসা-ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। সেই দৃশ্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাঁকে ঘুমের অভিনয় করতে হবে; পরিবর্ত্তে তিনি সত্যিসত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। নাটকের যবনিকা পড়লে দর্শকেরা মন্তব্য করলেন—আজ Coquelin-এর ঘুমের অভিনয় মোটেই স্বাভাবিক হয়নি; তাঁর নাসাধ্বনিও যেন কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হ'ল। তাঁর মত অভিনেতার পক্ষে এমন খারাপ ভাবে অভিনয় করা সঙ্গত হয়নি।...অভিনেতাকে সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে...যে, সত্যিকারের পাখীর ডাকে কোন শিল্প-কলার পরিচয় নেই; কলা নৈপুণ্য প্রকাশ পায়—মানুষ পাখীর ডাকের অনুকরণ করতে পারলে।

যাঁরা স্বাভাবিক অভিনয়ের দোহাই দেন, তাঁরা বলেন—পরকে কাঁদাতে হলে নিজেকে কাঁদতে হবে। তা যদি হয়...তা হলে, মাতালের ভূমিকা অভিনয় করতে হলে প্রচুর মদ্যপান করা উচিত—একথাও তো বলতে পারি! ঠিক স্বাভাবিক কাজ করলেই তাকে অভিনয় বলা চলে না; একেবারে স্বাভাবিক জিনিষ দর্শকের মর্ম্মস্পর্শ করে না। এর আর একটী উদাহারণ দেওয়া যায়...প্রসিদ্ধ অভিনেতা Mr. Edwin Booth-এর জীবনের একটী ঘটনা উল্লেখ করে। The Fool's Revenge নাটকে নায়কের চরিত্রে তিনি একদিন নিজেকে হারিয়ে ফেলে অভিনয় করেছিলেন। নাটকের পরিস্থিতি, অন্তরস্পর্শী সংলাপ, তাঁকে এমন অভিভূত করে ফেলেছিল, যে...তিনি নায়কের চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে মিশে গিয়েছিলেন; অভিনয় করতে করতে তাঁর বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগল, দু'চোখ বেয়ে অনবরত জলের ধারা নেবে এল। তাঁর মনে হল, এত সুন্দর অভিনয় বুঝি তিনি জীবনে আর কখনো করেননি। অভিনয় শেষ হতেই তাঁর মেয়েটী বক্স্ থেকে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করল—"তোমার কি অসুখ করেছে বাবা?

তুমি এত অস্বাভাবিক অভিনয় করবে আমি কল্পনাই করতে পারি নি।" Booth অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন—মেয়ের মুখের পানে। Diderot-এর ভাষায় বলা যায়—দর্শকের মন ভাবাবেগে আকুল করতে হলে, অভিনেতার আবেগ-চঞ্চল হওয়া উচিত নয়। সকল প্রকার পরিস্থিতির মধ্যেই অভিনেতার নিজের মনের ওপর কর্তৃত্ব থাকা প্রয়োজন।

অনেক সময় প্রশ্ন শোনা যায়, চরিত্র রূপায়ণে অভিনেতার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাবে কিনা! হাঁ, প্রতিভাধর অভিনেতা তাঁর অভিনীত চরিত্রে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আরোপ করে থাকেন। এ কথার মানে কিন্তু এ নয় যে, অভিনয় দেখার সময় চরিত্রের চাইতে অভিনেতাকেই বেশী করে দেখা যাবে। অভিনেতা নিজের ব্যক্তিত্ব চরিত্রের সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়ে দেবেন, যাতে করে, অভিনয় দেখার সময় দর্শক একবারও বুঝতে না পারে যে অভিনেতা কোথাও চরিত্রকে ছাপিয়ে উঠেছেন। অথচ নাটকখানি পড়বার সময়, কিম্বা অন্য কোন অপেক্ষাকৃত কম শক্তিমান অভিনেতা সেই চরিত্রে অভিনয় করবার সময়, দর্শকের বার বার মনে হবে—"এ হ'ল না! অমুক অভিনেতা যে চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন—তা কিছুতেই আর কারু দ্বারা সম্ভব হবে না।" দর্শকের মনে যখন অভিনয় দেখে এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জাগবে—তখন বলব তাঁর অভিনয়ে ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণ ছিল।

রূপসজ্জা

মানুষের জন্মগত সংস্কার—সে যা নয়···যা হ'তে পারেনি···নিজেকে সেইরূপে কল্পনা করা বা তেমন রূপ সজ্জা গ্রহণ করা। এমন কোন বালক নেই, যে নাকি ছেলেবেলায় নিজের মনের খেয়ালে নিজেকে সাজাতে চেষ্টা করেনি। সাজবার স্পৃহা মানুষের মনকে কল্পনাপ্রবণ করে; সে যখন যে আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে সাজায়, কল্পনার চোখে সে তখন নিজেকে সত্যিসত্যিই সেই আদর্শ হতে ভিন্ন মানুষ ভাবে না। মঞ্চাভিনয়ে রূপসজ্জা গ্রহণের প্রধান প্রয়োজনীয়তা··· অভিনেতাকে নিজের ব্যক্তিত্ব ভুলিয়ে রাখা এবং তার মনকে কল্পনাপ্রবণ করা। রূপসজ্জা দ্বারা অভিনেতা তার গৃহীত চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে এবং দর্শকের চোখেও মায়ার অঞ্জন বুলিয়ে দেয়। প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানকে ভুলে দর্শকেরা কাহিনীর মায়ালোকে প্রবেশ করেন।

অভিনেতা নিজে কখনও দর্শকের সামনে উপস্থিত হন না; তাঁকে অবলম্বন করে নানা আকৃতির মানুষ দর্শককে দেখা দেয়। এই মানুষগুলি হ'ল—নাট্যকারের রচিত বিভিন্ন চরিত্র। সুতরাং রূপসজ্জা বা makeup গ্রহণের পূর্ব্বে অভিনেতাকে বার বার পড়ে নাটকীয় চরিত্রকে সম্যক বুঝে নিতে হবে। চরিত্রের বাইরের আকৃতি বা চেহারা কি ধরণের হলে তার অন্তরের রূপটী পরিস্ফুট হবে—সেদিকে লক্ষ্য রেখে অভিনেতা রূপসজ্জা গ্রহণ করবেন। অন্তরের রূপ বাইরে প্রকাশ করাই রূপসজ্জার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে—তাহলে ভণ্ড চরিত্র···যেমন সাধুর বেশ কিন্তু আসলে সে শয়তান··· এরূপ চরিত্রের রূপসজ্জা কি হবে? এর জবাব: মানুষ পোষাক পরিচ্ছদে বা অন্য যে কোন দিক দিয়ে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা

করুক না কেন—তার চোখের চাউনিতে তার আসল রূপটী প্রকাশ পাবেই। চোখকে বলে মনের মুকুর। তাই চোখের রূপ-সজ্জা দ্বারা ভেতরকার মানুষটীকে প্রকট করে তুলতে হবে।

রূপসজ্জা করবার পূর্ব্বে অভিনেতাকে দুটী বিষয় মনে রাখতে হবে: রূপসজ্জা প্রধানতঃ নির্ভর করে Auditorium বা প্রেক্ষাগৃহের আয়তন এবং আলোক সম্পাতের ওপর। প্রেক্ষাগৃহ যত বড় হবে এবং মঞ্চের আলো যত জোরালো হবে···অভিনেতাকে তত বেশী প্রাথমিক রঙ্ দিয়ে রূপসজ্জা করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে: রূপসজ্জা এমন হওয়া দরকার, যেন প্রথম লাইনে যে সব দর্শক বসেছেন··তাঁরা অভিনেতার মুখের রঙ্, রেখা প্রভৃতি অস্বাভাবিক রকম বেশী হয়েছে, এইটে মনে না করেন···অথচ শেষ লাইনের দর্শকেরাও যেন অভিলষিত চরিত্রের যথাযথ রূপটী দেখতে পান। প্রেক্ষাগারের পেছন দিকের দুই তৃতীয়াংশ স্থানে বসে যদি অভিনেতার রূপসজ্জা যথোচিত বোধ হয়···তাহলেই গোটা প্রেক্ষাগারের সকল আসনের দর্শকের চোখে রূপসজ্জা নিখুঁত বোধ হবে।

রূপসজ্জার কয়েকটী সাধারণ সঙ্কেত মোটামুটি ভাবে এইবার বর্ণনা কচ্ছি:

রূপসজ্জা করবার আগে হাত মুখ বেশ ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর খুব হাল্কা করে খানিকটা "কোল্ড্ ক্রীম" মুখে মাখাতে হবে। আগে ক্রীম মেখে নেবার কারণ, ক্রীম লোমকূপগুলো বন্ধ করে দেয় এবং সেইজন্তে চামড়ার ভেতরে গিয়ে রঙ্ কোন রকম ক্ষতি করতে পারে না। ক্রীমের দ্বিতীয়

প্রয়োজনীয়তা—ক্রীম মুখের সব জায়গায় রঙ্‌কে সমানভাবে ছড়িয়ে দেয় এবং তৃতীয়তঃ, ক্রীম মেখে নিলে অভিনয়ের পর রঙ্‌ তুলে ফেলতে একটুও অসুবিধা হয় না।

প্রাথমিক রঙ্‌

এবার মুখের প্রাথমিক রঙ্‌। প্রাথমিক রঙ্‌ হিসাবে আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই গ্রীজ্‌পেণ্ট (Grease paint) বা তেলা রঙ ব্যবহৃত হয়। চিত্রকর ছবি আঁকবার সময় যেমন Sketch (নক্সা) তৈরী করে তাতে প্রাথমিক বর্ণ প্রলেপ দেন এবং অতঃপর সেই প্রাথমিক বর্ণের ওপর রেখা বা আলো ছায়ার লীলা ফুটিয়ে তুলে তাঁর চিত্রটীকে সম্পূর্ণ করেন···অভিনেতার রূপসজ্জাও তেমনি সম্পূর্ণ করতে হয়, প্রাথমিক বর্ণ প্রলেপকে ভিত্তি করে। মুখের ওপর আগে আঙুলের ডগায় করে গ্রীজপেণ্ট কতকগুলি ফোঁটার মতো লাগিয়ে নিতে হয়; তারপর সেই ফোঁটা টেনে টেনে মুখময় সমানভাবে মাখাতে হয়। ফোঁটাগুলি মুখে মাখাবার সময় বারবার আঙুলের ডগা জলে ভিজিয়ে নেওয়া উচিত; তা হলেই রঙ্‌ মুখের সব জায়গায় বেশ সমানভাবে লাগবে। রঙ মাখাবার সময় জোরে রগ্‌ড়াতে হয় না, মুখের মাঝখান থেকে পাশের দিকে আঙুলের ডগা খুব আলগোছে টেনে যাওয়া উচিত। মুখে প্রাথমিক বর্ণপ্রলেপের সময় অভিনেতা এই কথাটী মনে রাখবেন—রঙ্‌ খুব বেশী মাখানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। রূপসজ্জা চরিত্র ব্যঞ্জনার জন্য; বেশী রঙ্‌ মাখালে মুখের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি চাপা পড়ে গিয়ে কারিগরের গড়া পুতুলের-মুখের মত দেখায়। তবে, অনেক সময়, অভিনেতার স্বাভাবিক বর্ণের তারতম্য এবং প্রেক্ষাগারের আয়তনের পার্থক্য অনুযায়ী প্রাথমিক বর্ণপ্রলেপের তারতম্য ঘটাতে হয়।



সিরাজদ্দৌলা : নির্ম্মলেন্দু। গোলাম হোসেন : রবি রায়।

দণ্ডায়মান—"অভিযান" নাটকে মহম্মদ তোঘলক বেশে নির্ম্মলেন্দু



"মহানিশায়" রবিরায়





সন্তোষ সিংহ



"টিপুসুলতান" নাটকে ভূমেন রায়

আলো ছায়া

প্রাথমিক রঙ্ করা শেষ হলে, মুখে আলো ছায়ার (Light and Shade) সৃষ্টি করতে হবে। নারী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবক, প্রভৃতি প্রত্যেককে স্বাতন্ত্র্য দান করে মুখের আলো ছায়া। চরিত্রের বয়স বা স্বভাব অনুযায়ী মুখের যে সকল অংশকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার...সেই সকল অংশে হাল্কা রঙ এবং যে অংশকে অপ্রধান করা প্রয়োজন সেই অংশে অপেক্ষাকৃত গাঢ় রঙ দিয়ে আলোছায়ার সৃষ্টি করতে হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম High light ও Low light make up. যে সব অভিনেতার গাল তোবড়ানো—তাঁরা চোয়ালের হাড়ের ওপর গাঢ় রঙ্ এবং নীচের দিকে মানে গালের তোবড়ান অংশে খুব হাল্কা...অথবা শাদা কিম্বা হলদে গ্রীজপেণ্ট মাখিয়ে—তোবড়ানো গাল ভরাট্ করতে পারেন। মোটা নাককে সরু করতে হলে, নাকের মোটা অংশ গাঢ় রঙ্ দিয়ে চেপে দিতে হবে এবং নাকের যে অংশকে উঁচু বা প্রধান করে দেখান দরকার, সেই অংশে হাল্কা রঙ মাখাতে হবে। ঠিক এইভাবে, হাতের আঙুলকে সরু দেখাতে হলে, আঙুলের ডগা পর্য্যন্ত হাল্কা রঙের লাইন টেনে দুপাশ গাঢ় রঙে আব্ছা করে দিতে হবে। আলো ছায়া রচনার সময় অভিনেতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে...গাঢ় এবং হাল্কা রঙ যেন বেশ স্বাভাবিকভাবে ধীরে ধীরে এসে মিশে যায়; যেন দুটী রঙের দুটী স্বতন্ত্র লাইন কিম্বা প্যাচ্ (patch) বলে মনে না হয়। আস্তে আস্তে আঙুলের ডগা দিয়ে টেনে নিলেই আলো ছায়া চমৎকার ভাবে ফুটে উঠবে। কপাল, গাল, হাত যে কোন যায়গায় বর্ণপ্রলেপ দেবার সময় এই নির্দ্দেশটী অভিনেতা মনে রাখবেন—High light make upএর প্রয়োজন প্রাধান্য দেবার জন্য এবং Low light make up—প্রাধান্য লুপ্ত করবার জন্য।

চোখ

চোখ মনের মুকুর। সুতরাং চোখের রূপসজ্জা করবার সময় চরিত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অনুভূতি থাকা প্রয়োজন। সাধারণতঃ যুবকের চোখ আঁকতে হলে, চোখের পাতার ওপর হাল্কা নীল রঙ্‌ বা রুজ্‌ খুব সামান্য করে টেনে মিলিয়ে দিতে হয়। চোখের ঠিক নীচে গাঢ় নীল বা কাল রঙের একটী রেখা প্রান্ত পর্য্যন্ত আঁকতে হয়। এই রেখাটী অনেকে চোখ আঁকবার পেনসিলের সাহায্যেও এঁকে থাকেন। রেখাটী চোখের নীচের পাতার যত কাছে হয় ততই ভাল। একটু নেমে গেলে চোখের নীচের পাতাটী ফুলে উঠেছে বা ঝুলে পড়েছে মনে হবে। কেউ কেউ চোখের চাউনিকে উজ্জ্বল করবার জন্য চোখের ভেতরে ঠিক দুইকোণে সামান্য দুটী লাল রঙের বিন্দু এঁকে থাকেন। অভিনেতাকে স্মরণ রাখতে হবে, বয়সের সঙ্গে মুখের, গালের, চোখের··· সকল জ্যোতি ম্লান হয়ে আসে; যৌবনের ঔজ্জ্বল্যের ওপর একটী ম্লান তামাটে রঙের ছাপ পড়ে। চোখের রূপসজ্জা তাই বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্প্রভ করতে হবে। ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে চেহারার যে পরিবর্ত্তন আসে···তা আলো ছায়ার সমাবেশে কিম্বা চোখের কোণে বর্ণ বিন্যাসের তারতম্যে ফুটিয়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন। এই সময় মানুষ ধীরে ধীরে একটু প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করে; তার আচরণে, কথা বার্ত্তায় অপেক্ষাকৃত ধীর-গম্ভীর ভাব দেখা যায়। সুতরাং এই বয়সের পরিবর্ত্তন দেখাবার জন্য, বাইরের রূপসজ্জার ওপর বেশী প্রাধান্য না দিয়ে···অভিনয়ের দ্বারা সে পরিবর্ত্তন ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে হয়।

ঠোঁট

কথা না বললেও মানুষের চোখ মুখের ভঙ্গী বহু ক্ষেত্রে তার মনের কথা প্রকাশ করে দেয়। তাই চোখের মত, ঠোঁটকেও মানুষের মনের মুকুর বলা চলে। একটু খানি বাঁকানো ঠোঁট, একটু খানি কেঁপে ওঠা ঠোঁট···এমন অনেক কথা প্রকাশ করতে পারে—যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। ঠোঁটের রূপ-সজ্জার প্রতি অভিনেতার তাই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। যারা জীবনে বহু ঝড়-ঝাপ্টা সয়েছে, তেমন লোকের ঠোঁটের দুই কোণ সাধারণতঃ নীচের দিকে খানিকটা ঝুলে পড়ে; যাদের দুনিয়ায় কোন ভাবনা চিন্তা নেই, যারা মনের আনন্দে স্ফূর্ত্তি করে বেড়াচ্ছে,···তেমন লোকের ঠোঁটের কোন্ দুটি ওপর দিকে তোলা দেখতে পাওয়া যায়। ঈষৎ চাঁপা পাৎলা ঠোঁটকে বলি আমরা সৌন্দর্য্যের প্রতীক, পুরু ঠোঁট প্রধানতঃ নির্ব্বোধের লক্ষণ।

রুজ (Rouge) বা লিপ্স্টিক দিয়ে ঠোঁটে রঙ করবার পর, প্রয়োজন অনুযায়ী ঠোঁটের দুই প্রান্তে দুটি রেখা ওপরের দিকে টেনে দিলেই, ঠোঁট ওপরে ওঠা এবং নীচের দিকে টেনে দিলে, নীচের দিকে ঝুলে পড়া দেখান যায়। পুরু ঠোঁটে অপেক্ষাকৃত গাঢ় লাল রঙ এবং যদি কোন একটি ঠোঁট অপেক্ষাকৃত ছোট থাকে তাতে অপর ঠোঁটের চেয়ে একটু বেশী হাল্কা রঙ লাগালেও দুটি ঠোঁট সমান হয়ে যায়। বড় ঠোঁটকে ছোট এবং পাতলা দেখাতে হ'লে ঠোঁটের খানিকটা অংশ, মুখে যে রঙ বা পেণ্ট ব্যবহার করা হয়—তাই দিয়ে ঢেকে দিতে হয় এবং ঠোঁট যেটুকু দেখান দরকার সেই টুকুতে রুজ বা লিপষ্টিক লাগাতে হয়।

পাউডার

প্রাথমিক বর্ণ-বিন্যাস, আলোছায়ার দ্বারা মুখের যথাযথ স্থানে প্রাধান্য দান, চোখ এবং ঠোঁটে বর্ণ প্রলেপ এই ক'টি কাজ শেষ হবার পর গোটা মুখে পাউডার-পাফ্ (Puff) দিয়ে পাউডার লাগাতে হয়। মুখের গ্রীজ পেণ্ট, যেটুকুন পাউডার মুখে লাগা দরকার…মুখে আকর্ষণ করে নেয়; তারপর আলগোছে ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে ফেললেই বাড়্তি পাউডার পড়ে যায় এবং রঙের কাজ তখন একেবারে নিখুঁত হয়। পাউডার লাগাবার পর জিভ দিয়ে ঠোঁটের ওপরটা যদি খুব সাবধানে মুছে নেওয়া যায়—তা হলে ঠোঁটের লাল রঙের অনেক বেশী বাহার হয়।

ভ্রূ এবং চোখের পাতা

পাউডার করা শেষ হবার পর আর দুটি প্রধান কাজ বাকী থাকে: ভ্রূ আঁকা এবং চোখের পাতাকে ইচ্ছানুরূপ আকৃতি দেওয়া। ভ্রূ আঁকার ছাচে রঙ মাখিয়ে সেই ছাচ ভ্রূর ওপর চেপে ধরলে সুন্দর ভ্রূ তৈরী হতে পারে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মঞ্চের অভিনেতারা ছাপ ব্যবহার না করে, ভ্রূ টানবার পেন্সিল দিয়ে ইচ্ছানুযায়ী ভ্রূ এঁকে থাকেন। রাগী লোক, বদমাস, খুনী, স্বপ্নবিলাসী, চতুর বা শান্তি-প্রিয় লোকের ভ্রূর আকারের যথেষ্ট তারতম্য লক্ষিত হয়। পেন্সিলের সরু শিস্ দিয়ে অভিনেতা তাঁর প্রয়োজন মত ভ্রূর চুলগুলি পর্য্যন্ত এঁকে নিতে পারেন।

চোখের পাতায় লাগাবার জন্য ঘন, দীর্ঘ, নানা প্রকারের নকল পল্লব কিনতে পাওয়া যায়। পছন্দমত চোখের পল্লব কিনে এনে, তাকে চোখের পাতার মাপে কেটে, গঁদ দিয়ে ওপর ও নীচে দুটী পাতায় লাগিয়ে দিলেই অতি চমৎকার চক্ষু পল্লব রচিত হয়। অবশ্য পুরুষ



শ্রীমাতী শান্তি গুপ্তা



শ্রীমতী মলিনা



অভিনেতাদের চক্ষু-পল্লব ব্যবহার করার বেশী প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে এ জিনিষটি নিতান্ত দরকারী। সৌন্দর্য্য যাদের উপাসনা—চোখ তাদের সৌন্দর্য্য উপাসনায় বিকশিত পদ্মদল।

চরিত্রাভিনেতার রূপসজ্জা

কোন "বিশেষ চরিত্রে" কিম্বা "টাইপ চরিত্রে" অভিনয় করতে হলে, অভিনেতা উপরে বর্ণিত রূপসজ্জার সাধারণ নির্দ্দেশগুলি ব্যতীত প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ রূপসজ্জার সাহায্য নেবেন। বৃদ্ধের কপালে, গালে, নাকের ডগার পাশ থেকে ঠোঁট পর্য্যন্ত···যেসব রেখা সাধারণতঃ দেখা যায়, সেইগুলিকে ভাল করে ফুটিয়ে তুলবেন। মুখের বিভিন্ন অংশ সঙ্কুচিত করলে এই রেখাগুলি দেখা দেয়; রেখার ওপর ব্রাউন পেন্সিলের দাগ টেনে, পরে আঙ্গুল দিয়ে আস্তে আস্তে রেখার ধারগুলি মিলিয়ে দিলেই বৃদ্ধের রূপসজ্জা সুন্দর হয়।

নাক, থুঁতনী বা মুখের অন্য যে কোন অংশ খুব মোটা বা সরু করে দেখাতে হলে নোজ পেষ্ট (Nose paste) লাগিয়ে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। দাঁত কালো হলে "শাদা টুথ্ এনামেল" এবং শাদা দাঁতকে খানিকটা বা সম্পূর্ণ ভাঙ্গা দেখাতে হলে প্রয়োজন মত যথাস্থানে "কালো টুথ্ এনামেল" লাগালে অভিনেতার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

গোঁফ দাড়ী ছোট বা বড় যেমন ইচ্ছা, "ক্রেপ হেয়ার" দিয়েই সব চেয়ে ভাল তৈরী হয়। তুলিতে করে "স্পিরিট গাম্" দিয়ে আগে চিবুকে এবং ওপরের ঠোঁটে গোঁফ দাড়ী এঁকে নিতে হয়; গাম্ প্রায় শুকিয়ে এলে তখন ক্রেপ হেয়ার তার ওপর চেপে ধরলেই লেগে যায়।

শরীরের যে কোন স্থানে আঘাত লেগে ফুলে উঠেছে বা কাল দাগ পড়ে গেছে…এ রকম দেখাতে হলে "নোজ পেষ্ট" লাগিয়ে তার ওপর শাদা আর নীল রঙ মাখাতে হয়। ক্ষত চিহ্ন গভীর দেখাতে হলে, যথাস্থানে Non Flexible Collodion তুলি দিয়ে লাগাতে হয়।

রূপসজ্জার উপকরণ

কোল্ড ক্রীম, গ্রীজ পেণ্ট, রুজ, লিপষ্টিক, পাউডার, পাউডার-পাফ, ভ্রূ টানবার পেনসিল, টুথ্ এনামেল, নোজপেষ্ট, কলোডিয়ন, বাদামী রঙ, কালি, ব্লু রঙ, ক্রেপ হেয়ার, স্পিরিট গাম্, তুলি, চিরুণী, কাঁচি, তোয়ালে প্রভৃতি।

দৃশ্য-শিল্পী ও আলোক-দক্ষ

নাটক অভিনয়ে দৃশ্যপট যোজনা ও আলোক সম্পাতের উদ্দেশ্য কি? নাটকের উপযুক্ত পরিস্থিতি রচনা করা, চরিত্র রূপায়ণে সাহায্য করা, এবং সমগ্র নাটকখানিকে গতি (Movement) দান করা। এই তিনটি কার্য্য সুসম্পন্ন হলেই Illusion বা মায়া-বিভ্রম সৃষ্টি হয়। দর্শক, সুরচিত দৃশ্যপটের সামনে...আলোছায়ার লীলার মধ্যে যা দেখতে পায়...তাকে তখন সত্য বলে বিশ্বাস করে; নাটকীয় চরিত্রের প্রিয়-মিলনে তারা আনন্দিত হয়...তার বিচ্ছেদ-বেদনা দর্শকের মনকেও অপরিসীম বেদনায় বারবার দোলা দিয়ে যায়।

নাটকীয় চরিত্রকে রূপায়িত করতে...নাটকের ঘটনাকে গতি-শীল করতে—দৃশ্যপট ও আলোক সম্পাত। সুতরাং দৃশ্যশিল্পী ও আলোক-দক্ষকে...যাঁরা নাটকের চরিত্র রূপায়িত কর্চ্ছেন, তাঁদের সহায়তা করবার জন্যই সমস্ত শিল্প-কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। তাঁরা দর্শকের জন্য নন্—অভিনেতার জন্য। যখনই কোন অলৌকিক দৃশ্য দেখে দর্শক হাততালি দিয়ে ওঠে, সে দৃশ্য রচনায় দৃশ্য-শিল্পীর যত বাহাদুরীই থাকুক না কেন—মঞ্চ-শিল্পের দিক হতে, তাকে বলব সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কারণ, নাটকীয় চরিত্র বা ঘটনাকে ছাপিয়ে সেই দৃশ্যটী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—নাটকের একমুখী গতি, কাহিনীর বিভ্রম-সৃষ্টির প্রয়াস সে ব্যাহত করেছে—নাটক থেকে আলাদা হয়ে—সে দর্শককে নিজের দিকে টেনে নিতে চাইছে। তাই বলছিলুম, দৃশ্য-সজ্জা, আলোক সম্পাত—অভিনেতার জন্য,—দর্শকের জন্য নয়। অভি-নেতা যদি বোঝেন, কোনও বিশেষ দৃশ্য বা আলোক সম্পাত তাঁর চরিত্র রূপায়ণের অনুকূল হয়েছে—তবেই সে দৃশ্য রচনা, সে আলোক সম্পাত সার্থক হল। Sir Henry Irving এই মত পোষণ করতেন; তাই একদিন wingsএর খানিকটা যায়গায় রঙ লাগানো

হয়নি বলে—তিনি শিল্পীকে ডেকে পাঠালেন। দৃশ্য-শিল্পী বললেন: "ও অংশটুকু প্রেক্ষাগার থেকে দেখা যায় না: তাই ওটুকুতে রঙ লাগাইনি।" জবাবে Sir Irving বললেন: "দর্শকেরা না দেখুক, আমার অভিনেতারা তো দেখতে পাবে? অভিনয় কালে ঐ রঙ-ছাড়া যায়গাটুকু চোখে পড়লে, অভিনেতাদের চরিত্র-রূপায়ণে একাগ্রতা নষ্ট হতে পারে।" তিনি পূরো wings তাই রঙ করিয়ে নিলেন।

ঠিক এম্নি ধরণের গল্প শুনেছিলাম—চলচ্চিত্রে Cleopetra বইএর পোষাক সম্পর্কে। Cleopetraর পোষাক তৈরী হ'ল অজস্র অর্থ-ব্যয় করে—নীল-নদীর রঙের অনুরূপ মহার্ঘ্য সিল্কের কাপড়ে। পরিচালককে একজন জিজ্ঞাসা করলেন: "অত দামী সিল্ক এবং সামান্য সিল্ক বা সাটিনের রঙ যদি ঠিক এক হয়—ক্যামেরাতে তো এক রকমই দেখাবে। Cleopetraর পোষাকের জন্য এত টাকা যে খরচ করা হল—ছবি দেখবার সময় দর্শক তা জানবে কি করে? তারা তো ওকে সামান্য সিল্ক বা সামান্য সাটিনও মনে করতে পারে?" পরিচালক জবাব দিলেন: "দর্শক না জানুক—আমার অভিনেত্রী জানে তার পোষাকের দাম। এই পোষাক তার মনের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করবে—Cleopetraর চরিত্র রূপায়ণে তাতে তার যথেষ্ট সুবিধা হবে।" পোষাক, দৃশ্যপট, আলোকসম্পাত, সকল বিষয়েই Cleopetra-পরিচালকের এই যুক্তি প্রয়োগ করা চলে। অভিনেতাকে কেন্দ্র করেই এই সকল বিভাগের শিল্পীদের কলা নৈপুণ্য দেখান উচিত।

ঘূর্ণীমঞ্চ, শকটমঞ্চ এবং ডুবরী (?) মঞ্চ (Revolving, Wagon and Sinking Stage) প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাট সীনের (Flat Scene) রেওয়াজ এক রকম উঠে গেছে। ঐ সকল মঞ্চে দু' তিনটী দৃশ্য, আগে থেকে, এক সঙ্গে সাজিয়ে রাখা যায়; তাই প্রায় প্রত্যেক দৃশ্যেই সেট্‌সীন্ (Set Scene) ব্যবহার করা হয়। তবে, আমাদের দেশে সর্ব্বত্র Revolving Stage বা ঘূর্ণী মঞ্চ নেই: বর্ত্তমানে Wagon Stage আমাদের কোন রঙ্গ-গৃহে ব্যবহৃত হয় না; এবং Sinking Stageএর প্রবর্ত্তন আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে একেবারেই হয়নি। যাঁদের Revolving stage নেই, তাঁরা···মঞ্চের পিছন দিকে যখন Set scene সাজানো হয়—তখন বাধ্য হয়ে সামনের দিকে Flat scene ব্যবহার করেন। মোট কথা Flat sceneএর কদর আমাদের দেশেও কমে গেছে। এক দৃশ্যে একটী নাটক অভিনয় করবার সুবিধা থাকলে কোন রঙ্গমঞ্চই এখন আর Flat Scene ব্যবহার করতে চান্ না। নাট্য-নিকেতনে অভিনীত একটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ "ঝড়ের রাতে" নাটকে, মঞ্চ-শিল্পের প্রশংসনীয় পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। Set scene তৈরী করতে চিত্র-শিল্পীর সঙ্গে স্থপতির যোগাযোগ হয়। বাড়ী ঘরের দরজা, জানালা, খিলান, Set sceneএ শুধু রঙের তূলি বুলিয়ে আঁকা হয় না···স্থপতি তার সম্পূর্ণ অবয়বটি গড়ে তুলতে চিত্র-শিল্পীকে সাহায্য করেন।

চিত্রশিল্পী ও স্থপতির সমবেত প্রচেষ্টায় যখন একটী দৃশ্য রচিত হয়—আলোকশিল্পী বিচিত্র আলোক সম্পাত নৈপুণ্য দ্বারা তার যথাযথ রূপটী সম্পূর্ণ করে তোলেন। কি ভাবে আলোক নিয়ন্ত্রণ করলে···দৃশ্যটীর নাটকের প্রয়োজন অনুযায়ী রূপ ফুটে উঠবে—সে বিষয়ে আলোক-শিল্পীর যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

কোন দৃশ্যের পিছন দিকটা অন্ধকার, মাঝখানটা উজ্জ্বল এবং সামনের অংশ অপেক্ষাকৃত আব্‌ছা করে রাখলে—দৃশ্যটার যথেষ্ট depth আছে মনে হবে। ঘরের দেওয়াল, চওড়া জানালা প্রভৃতির ওপর জোর আলো ফেলে সামনের আসবাবপত্র ঈষৎ অন্ধকারে রাখলেও ঘরের depth বোঝান যায়। তেমনি আবার দৃশ্যের মধ্যে যেখানে curve বা গোলাকার অংশ আছে, আলোকসম্পাত দ্বারা সেই অংশগুলি বেশী উজ্জ্বল করে তুললে…দৃশ্যটার Roundness চমৎকারভাবে ফুটে উঠ্‌বে।

Set Sceneএ ঘর বাড়ী দেখাতে হলে অধিকাংশক্ষেত্রেই Box Set তৈরী করা হয়। ঘরের চারদিকের চারটী দেওয়াল; দর্শকের সামনের দেওয়ালটী শুধু ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে; বাকী তিনটী দেওয়ালসহ ঘরের যে চেহারা হয়—Box Sceneএর ঘর আমরা ঠিক সেই ধরণের দেখতে পাই। তিনটী দেওয়ালের পরিবর্ত্তে ছোট বড় অনেকগুলি কোণ (Angle) বা'র করা…চার, পাঁচ বা তদূর্দ্ধ ছোট, বড় দেওয়াল দিয়ে Angle Set তৈরী করা যায়। গতানুগতিক Box Setএ অভিনয় করবার চাইতে, Angle Setএ অভিনয় করতে অভিনেতা অনেক বেশী তৃপ্তি পান। Box Sceneএ ঠিক মাঝখানে কিম্বা ডাইনে বা বাঁয়ের দরজা দিয়ে চলাফেরা করতে হয়; Angle Setএ অভিনেতার সুবিধা অনুযায়ী মঞ্চের যে কোন দিক থেকে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা চলে। তা ছাড়া Angle Setএ দৃশ্যের depth যত চমৎকারভাবে দেখান যায়—Box Sceneএ তেমন সম্ভব নয়।

মঞ্চের সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে কোন বিরাট দৃশ্যের অবতারণা করবার

প্রয়োজন হলে, দৃশ্যটী সম্পূর্ণ না দেখিয়ে, তার বিরাটত্বের গোটাকতক বৈশিষ্ট্যমূলক ইঙ্গিত দিলেই দর্শকেরা সম্পূর্ণ দৃশ্যটী কল্পনা করে নেন্। যেমন, মঞ্চে কোন জাহাজ দেখাতে হলে—নোঙ্গর, চাকা, দড়ি এবং প্রকাণ্ড মাস্তুলের খানিকটা অংশ সুকৌশলে সাজিয়ে দিতে হয়। একটা বড় খেলনার মত সম্পূর্ণ জাহাজের চেয়ে—ঐ কটী বস্তু দ্বারা অনেক ভাল করে বড় জাহাজের ইঙ্গিত দেওয়া চলে।

রঙ্, কাঠ, কাপড় প্রভৃতি দৃশ্য রচনার উপাদানগুলি প্রচুর পরিমাণে হাতে না পেলে, ভাল দৃশ্য রচনা করা যায় না—এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দৃশ্য-শিল্পী প্রথমে ভাববেন: কোন ধরণের দৃশ্য নাটকের চরিত্রের কার্য্য-কলাপের সম্পূর্ণ অনুকূল হবে। তারপর ভাববেন: নাটকীয় চরিত্রের উপযুক্ত পশ্চাৎপট হিসাবে সেই দৃশ্যকে কি উপায়ে সব চেয়ে সহজে ও সুন্দর করে তৈরী করা যাবে। যেখানে অর্থাভাবে উপযুক্ত উপাদানগুলি সংগ্রহ করা যায় না, সেক্ষেত্রেও দৃশ্য শিল্পীকে হতাশ হলে চলবে না। নিউ ইয়র্ক (New york)-এর Theatre Guild এক সময় ছিল অতি দরিদ্র সৌখীন অভিনেতাদের নাট্যশালা। সীন্ আঁকবার পয়সা নেই; তাই বর্ণ-নিরপেক্ষ (neutral-coloured) কাপড়ের টুক্‌রো জুড়ে, তাই সীনের মত করে তাঁরা পিছনে টাঙিয়ে দিলেন। সেই কাপড়ের ওপর নানাপ্রকার রঙীন আলো ফেলে গাছপালা, ঘরবাড়ী প্রভৃতি দৃশ্যের আভাষ দিলেন। অপরিসীম দারিদ্র্যের পীড়নে তাঁরা সেদিন neutral coloured কাপড় ব্যবহার করেছিলেন; পরবর্ত্তীকালে সেই neutral coloured কাপড়ই প্রত্যেক দেশের রঙ্গমঞ্চে Sky cloth হিসাবে সমাদর পেল, তা দিয়ে মঞ্চে plaster wall তৈরী হল। অর্থাভাবে এককালে যারা মঞ্চের গতানুগতিক পথে চলবার অধিকার না পেয়ে—নূতন

নূতন পথ আবিষ্কার করবার সুযোগ পেয়েছিল—সেই দরিদ্র শিল্পীদের Theatre Guild আজ সারা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যশালা, আমেরিকার ধন-কুবেররা আজ তার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন!

আজকাল কোন কোন মঞ্চে drapery workএর প্রচলন হয়েছে। রঙীন পর্দ্দা দিয়ে ঘর তৈরী হচ্ছে; সেই পর্দ্দা কুঁচিয়ে, গোল করে, ইচ্ছামত সাজিয়ে, তার দ্বারা মোটামোটা থাম, দরজা, জানালা প্রভৃতি দেখান হচ্ছে। Drapery workএর সঙ্গে আঁকা সীন, বা কাঠের তৈরী দরজা, জানালা—মোটেই মানানসই হয় না। সত্যিকারের দরজা বা আঁকা দরজার চেয়ে···রঙীন পর্দ্দায় খানিকটা ফাঁক রেখে দিলেই তা দরজা হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। Drapery workএর পশ্চাৎপটরূপে শুধু Neutral Coloured Sky ব্যতীত, অন্য কিছু ব্যবহার করা উচিত নয়। শচীন্দ্রনাথের "ধাত্রী পান্না" ও "রাষ্ট্র বিপ্লব" নাটকের অভিনয়ে অঙ্কিত দৃশ্যের পরিবর্ত্তে Drapery workএর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল।

রঙীন পর্দ্দার সাহায্যে অভিনয় করতে হলে, পর্দ্দার রঙ্ বেছে নেবার সময় একটী কথা মনে রাখতে হবে: যে দৃশ্যে যে ধরণের রস দর্শককে পরিবেশন করতে হবে—সেই দৃশ্যের পর্দ্দার রঙও যেন সেই রসের অনুযায়ী হয়। শৃঙ্গার রসে শাদা·· বীররসে হলদে···করুণরসে ঈষৎ পাটলবর্ণ·· হাস্যরসে শাদা এবং কালো·· ভয়ানক রসে নীল···বীভৎস-রসে ধোঁয়াটে···অদ্ভুত রসে কালো···এবং রৌদ্ররসে লাল রঙের পর্দ্দা ব্যবহার করা উচিত। তা ছাড়া, কেবল লাল রঙ্ সব রসেরই অনুকূল বলে—সব দৃশ্যে ব্যবহার করা চলে।



বিভিন্ন রূপসজ্জায় : নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী



"নার্সিংহোমে" রাণীবালা, অহীন্দ্র চৌধুরী ও জহর গাঙ্গুলী

মঞ্চে আলোকসম্পাত করা হয়, অভিনেতা যাতে শোভন ভাবে নাটকের চরিত্রকে রূপায়িত করতে পারেন, সে বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য। কিন্তু তা বলে, কোন্ বিশিষ্ট অভিনেতাকে, তিনি যত জন-প্রিয়ই হোন্ না কেন—নাটকের আর সবাইকে ছেড়ে, তাঁকে প্রাধান্য দেবার জন্য আলোকসম্পাত করা অত্যন্ত অসঙ্গত। আলোক-শিল্পী লক্ষ্য রাখবেন, কি উপায়ে সমস্ত নটনটীকে দিয়ে সমগ্রভাবে নাটকের রূপটী ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়। ঐক্যতান বাদনের মত অভিনয়ে সমস্ত শিল্পীর একটী সংহত এবং সমবেত সুর সৃষ্টির প্রয়াস থাকবে। যে নাটকের যা মূল সুর—আলোকসম্পাতও হবে তদনুযায়ী।

ভাবগম্ভীর নাটকের আলোকসম্পাত হবে অত্যন্ত সংযত; মেলোড্রামায় মৃদু আলোকসম্পাতে থাকবে আলো ছায়ার লীলা এবং হাস্যরসাত্মক বা মিলনান্ত নাটক আলোর প্রাচুর্য্যে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনের মত ঝলমল করবে। আলোর ইঙ্গিত, নাটকের সূচনাতেই দর্শককে নাট্যরসের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করবে; তাদের মন সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির আশায় উন্মুখ হয়ে থাকবে।

আগামী কালের মঞ্চ

মঞ্চরূপ পরিকল্পনায় যার মত বিরাট প্রতিভা আজ পর্য্যন্ত আর আবির্ভূত হয় নি—সেই এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেগের (Edward Gordon Craig) কথা বলব। আদর্শ রঙ্গমঞ্চের যে রূপ তিনি পরিকল্পনা করেছেন—হয়তো সেভাবে মঞ্চলোককে রূপায়িত করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা বলেছেন—"আমার স্বপ্নকে আমি সারা জগতের সামনে কথায় প্রকাশ করেছি; সে স্বপ্ন বাস্তবলোকে মূর্ত্তি নেবে কি নেবে না—তা ভাবুক্ ভাবীকাল।" গর্ডন ক্রেগের সেই আদর্শ পরিকল্পনার মূলে রয়েছে—Uber Marionette…অভিনেতার পরিবর্ত্তে পুতুল দিয়ে অভিনয় করান…সে অভিনয়ে নাটক হবে কথাবিহীন!

যে পরিকল্পনা কোন দিন বাস্তবজগতে রূপ নেবে কি না—সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে—তার কথা এখন না-ই বা বললাম। আজকের মঞ্চ সুসংস্কৃত হয়ে আগামী কাল যে মূর্ত্তি নেবে, সেই আগামী কালের মঞ্চের স্বরূপ সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব। আমরা গর্ডন ক্রেগের পরিকল্পিত আগামী কালের মঞ্চ বিষয়ক মতবাদ আংশিকভাবে গ্রহণ করেও আমাদের বর্ত্তমানের মঞ্চলোক সেই অনুযায়ী সংস্কার করে নিতে পারব কি?

থিয়েটারের আর্ট বলতে কি বুঝব? অভিনয়? না;…অভিনয় থিয়েটারের আর্টের একটি অংশ। নাটক? না…নাটক সাহিত্যের একটি বিশেষ শ্রেণী। থিয়েটারের আর্ট দৃশ্যপটও নয়, নৃত্যগীতও নয়। তবে? থিয়েটারের আর্ট—অভিনয়, নাটক, দৃশ্যপট ও নৃত্য-গীত যে সব উপাদানে তৈরী—তাদের সমন্বয়ে। Action বা ক্রিয়া নিয়েই অভিনয়, বাক্য নিয়ে নাটক, বর্ণ ও রেখা নিয়ে দৃশ্যপট

এবং ছন্দ নিয়েই নৃত্য গঠিত হয়। ক্রিয়া, বাক্য, বর্ণ, রেখা এবং ছন্দ—এদের সমন্বয় হলে তখনই আমরা দেখতে পাই থিয়েটারের আর্ট। আর্টের এই সম্মিলিত উপাদানের কোনটিকে উপেক্ষা করবার উপায় নেই; চিত্রকরের ব্যবহৃত বিভিন্ন রঙের মত মঞ্চের পূর্ণাঙ্গ চিত্রের জন্য এরা সকলে প্রয়োজনীয়। তবে এক হিসাবে বিচার করলে—Action বা ক্রিয়ার মূল্য সব চেয়ে বেশী। রঙীন ছবির সঙ্গে মূল রেখাচিত্রের (Drawing) যে সম্পর্ক, থিয়েটারের আর্টের সঙ্গে ক্রিয়ারও ঠিক সেই সম্পর্ক। ক্রিয়া, গতি ও নৃত্যের মাঝখান থেকেই উদ্ভব হয়েছে থিয়েটারের আর্ট।

থিয়েটারের জন্যই নাটক রচিত হয়। সুতরাং নাটক পড়বার জিনিষ নয়; দেখবার জিনিষ। এবং দেখবার জিনিষ বলেই, তাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া (Gesture) বর্তমান থাকবে। নৃত্যবিদের কাজ হল, বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়ায় বা ছন্দে…ভাবের অভিব্যক্তি। সুতরাং নৃত্যবিদ্ হতেই নাট্যকারের উদ্ভব। আদিম নাট্যকার শুধু কথা দিয়ে নাটক রচনা করেননি; তাঁর নাটকে ছিল – ক্রিয়া, বাক্য, বর্ণ, রেখা ও ছন্দের সম্মিলন। সুকৌশলে এই পাঁচটির সমন্বয় সাধন করে, তিনি মানুষের চোখ এবং কাণ এই দুটি ইন্দ্রিয়ের পথ ধরে, রূপ-রসের ক্ষুধা মিটিয়েছিলেন।

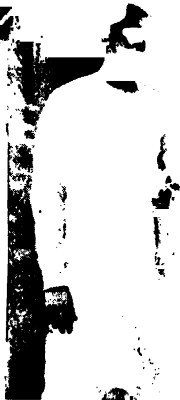
আদিম ও বর্তমানের নাট্যকারের মধ্যে তফাৎ কোথায়? আদিম নাট্যকার বাইরের জগৎ থেকে পরিব্রাজকের মত মঞ্চলোকে আসেননি—মঞ্চজগতের ভেতরই হয়েছিল তাঁর অভ্যুদয়; পিতৃপুরুষের রক্তধারার মত তাঁর দেহের অনুপরমাণু জুড়ে ছিল মঞ্চ-চেতনা। আধুনিক নাট্যকারের মঞ্চজগতের সঙ্গে সে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই।

তাই আদিম নাট্যকার জন্মগত সংস্কারের মত মঞ্চলোকের এমন কতকগুলি তথ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, যা আজকের দিনের নাট্যকার এখনও আয়ত্ত করতে পারেননি। আদিম নাট্যকার জানতেন, তাঁর কল্পিত চরিত্রগুলি দর্শকের সামনে উপস্থিত হলে—দর্শকেরা, চরিত্র যা বলবে তা শোনবার চেয়ে, চরিত্র যা করবে তাই দেখবার জন্যে অনেক বেশী আগ্রহ প্রকাশ করবে। তিনি এই সাধারণ সত্যটি জানতেন যে···মানুষের আর সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চেয়ে চোখকেই সব চেয়ে তাড়াতাড়ি অভিভূত করা যায়। চরিত্র তথা অভিনেতা, মঞ্চে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই, সবার প্রথমে তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানায় হাজার হাজার কৌতূহলী, রূপ-পিয়াসী চক্ষু। উৎসুক, জিজ্ঞাসু সহস্র চক্ষুর সঙ্গে···তাঁর রচিত চরিত্রগুলি···গদ্যে হোক্, পদ্যে হোক্—যা কিছু কথা বলবে···সবই ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে। গদ্য-ক্রিয়ার নাম অঙ্গভঙ্গী বা Gesture এবং পদ্য-ক্রিয়ার নাম নৃত্য।

আজকের দিনের নাট্যকার বড় মুখর; রচনা তাঁর কথা-প্রধান; তাঁর নাটকের আবেদন··চোখের চেয়ে কাণের ভেতর দিয়ে। তবু আজও দর্শকেরা থিয়েটারে যায়—থিয়েটার দেখতে··থিয়েটার শুনতে নয়! নাটক পরিবর্ত্তিত হয়েছে—নাট্যকার পরিবর্ত্তিত হয়েছে—কিন্তু দর্শক আজও সেই আদিমকালের শাশ্বত মানুষটি!···নাটক দেখবার জন্য, নাটক পড়্তে গেলেই তাকে অসম্পূর্ণ বোধ হবে। অবশ্য Shakespeareএর নাটকের কথা স্বতন্ত্র। Hamlet পড়বার সময় যে আনন্দ পাই—অভিনয় দেখে ঠিক তেমনটি কখনও পেতে পারি না। অভিনয় দেখে মনে হয়, "না, Shakespeareএর Hamlet ঠিক এ জিনিষ নয়।" যখন কোন সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করবার জন্য



মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য



শৈলেন চৌধুরী



প্রভাত সিংহ ও শরৎ চ্যাটার্জ্জি



(১) "কঙ্কাবতীর ঘাটে" বীণা, ধীরেন দাস, শিবকালী।

(২) অভিনয়ের অবকাশে বীণা, অপর্ণা।

(৩) অভিনয়ের অবকাশে সিধু গাঙ্গুলী, পঞ্চানন বন্দ্যোঃ, ভূপেন চক্রঃ।

(৪) "কঙ্কাবতীর ঘাটে" যূথিকা, পঞ্চানন, কমল, বীণাপাণি, জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি

আর কিছুর সাহায্য প্রয়োজন হয় না—তখন সেতো নিজেই সম্পূর্ণ Shakespeare যখন Hamletএর শেষ লাইনটি লিখেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁর সৃষ্টিও সম্পূর্ণ হয়েছিল। তাই তার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী, দৃশ্যশোভা, সজ্জা অথবা নৃত্য সংযুক্ত করবার কোন প্রয়োজন হয় না।

আগামী কালের শিল্পী কেবল কি সুসম্পূর্ণ নাটকের ভাষ্যকার রূপে বেঁচে থাকতে চায়? তার মনের ভেতর নিজস্ব সৃষ্টির প্রেরণা কি কোন দিন জাগবে না? তা যদি জাগে, তবে তাকে আগামী কালে এমন নাটক অভিনয় করতে হবে,—যা পড়লে সম্পূর্ণ হয় না: যে নাটক পূর্ণতা লাভ করবে…কেবল মাত্র রঙ্গমঞ্চে এসে। মঞ্চলোকের শিল্পী তাকে ক্রিয়া দেবে, বর্ণ ও রেখা দেবে, গতির ছন্দ দেবে, দৃশ্যশোভায় সজ্জিত করবে…তারপর সে নাটক হবে পূর্ণাঙ্গ।

মঞ্চলোকের যা নিজস্ব শিল্পকলা—আধুনিক নাট্যজগত তা হারাতে বসেছে; নাট্যজগতের অধোগতি হয়েছে। শুধু নাট্যজগতের নয়… দর্শকেরও অধোগতি হয়েছে, নইলে তারা রঙ্গমঞ্চে এসে পূর্ণ আনন্দ লাভ করে কি করে? কেন তারা অতৃপ্ত হয়ে ফিরে যায় না? কেন শ্রেষ্ঠতর, মহত্তর সৃষ্টির দাবী জানায় না? অবশ্য, এ জন্য দর্শককে দোষী করা চলে না; সুরলোকের সন্ধান তারা পায়নি— তাই অসুরলোকেই তারা স্বর্গগঙ্গার কলধ্বনি শুনছে মনে করে।

রঙ্গমঞ্চে সত্যিকারের নাট্যকলার সাধনা নেই—তার কারণ এ নয় যে—দর্শকেরা সে বস্তু চায় না। শিল্পীর অভাবে নাট্যকলার অবনতি—সে কথাও স্বীকার করা চলে না। শক্তিমান শিল্পী

আছে—কিন্তু সে জানে না তার শক্তির পরিমাপ···জানে না কোন উপাদানে, কেমন করে গড়ে তুলবে নাট্যভারতীর মর্ম্মর-সৌধ; শিল্পীকে সে বিষয়ে নির্দেশ দেবে কে? কে তাকে চালিত করবে? আধুনিক মঞ্চলোকে অভাব সেই শক্তিমান নেতার—অথবা পরিচালকের। পরিচালকের সঙ্গে শিল্পীদের সম্পর্ক—অধিনায়কের সঙ্গে অর্কেষ্টার মত—পুস্তক প্রকাশকের সঙ্গে মুদ্রাকরের মত।

নাট্যকারের হাত থেকে পরিচালক যখন নাটক গ্রহণ করেন—তিনি নাট্যকারকে এই প্রতিশ্রুতি দেন, যে···নাটকখানিকে তিনি যথাযথভাবে মঞ্চে রূপায়িত করবেন। নাটক পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের বর্ণ, সুর, গতি এবং ছন্দ··তাঁর মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নাট্যকার যদি কোথাও দৃশ্যের বর্ণনা, বা মঞ্চাভিনয় সম্বন্ধে নাটকে কোন ইঙ্গিত দেন—পরিচালক সে সব ইঙ্গিত নিয়ে একটুও মাথা ঘামান্ না।

নাটকীয় চরিত্রের ভেতর থেকে পরিচালক যা কিছু ইঙ্গিত সংগ্রহ করেন; নাট্যকারের নিজের কোন ইঙ্গিত দেবার অধিকার নাই। খারাপ অভিনয় করার অর্থ অভিনেতা শক্তিহীন। কিন্তু অভিনেতার সবচেয়ে বড় অপরাধ—নাটকের কথা বাদ দেওয়া, অথবা নাটকে নিজের কথা বসিয়ে নেওয়া। নাট্যকার কর্ত্তৃক কথার সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত; মঞ্চরূপ পরিকল্পনা বিষয়টী পরিচালক কর্ত্তৃক সংরক্ষিত। একজন কর্ত্তৃক অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করাই অপরাধ।

বারম্বার নাটক খানিকে পাঠ করে যে সব বর্ণ, ছন্দ, গতি, পরিচালকের কল্পনা নেত্রে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে—তাই নিয়ে তিনি

তাঁর প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করেন। আধুনিক কালের রঙ্গমঞ্চে নাট্যশিল্পের অবনতির একটি প্রধান কারণ…পরিচালক নাটকের বিভিন্ন রূপের পরিকল্পনার দায়ীত্ব বিভিন্ন শিল্পীর ওপর ছেড়ে দেন। তিনি নাট্যকারকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাটক গ্রহণ করেছিলেন? তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল…নাটকের, কথাকে আমি সুর দেব, ছন্দ দেব; ভাবকে রেখাচিত্রে, রঙের স্পর্শে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দেব: নাট্যকারের সৃষ্টিকে আমি কোথায়ও এতটুকু ক্ষুণ্ণ করব না,—অতিক্রম করব না।… এই যে প্রতিশ্রুতি—একে যথাযথ ভাবে রক্ষা করতে হলে—সমস্ত দিককার পরিকল্পনা পরিচালকের নিজের করা উচিত। তাঁর একার মনে যে পরিপূর্ণ রূপটী জাগবে—ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী নাটককে ইচ্ছানুযায়ী রূপায়িত করলে—তাতে বিভিন্ন রুচীর সঙ্ঘর্ষ বাধবে: বর্ণ ছন্দকে ছাড়াবে—ছন্দ গতিকে অতিক্রম করতে চাইবে। পরিকল্পনায় ঐক্য থাকবে না—ফলে নাট্যরস সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে।

মঞ্চে কি ভাবে নাটক রূপায়িত করবেন, তার নমুনা তৈরী করতে বসে—পরিচালক কেবল ঐতিহাসিক সত্যের দিকেই লক্ষ্য রাখেন না। সবার আগে, নাটকের মূল সুরের সঙ্গে যার সামঞ্জস্য আছে—ঠিক সেই রঙটী তিনি বেছে নেন্। সেই রঙ দিয়ে তিনি চিত্রপট তৈরী করেন—নাটকের প্রয়োজন অনুযায়ী তাতে দরজা, জানালা, আসবাব-পত্র যেখানে যেমনটি দরকার সেই ভাবে স্থাপনা করেন। তার পর একে একে সেই চিত্রপটে নাটকের চরিত্রদের নিয়ে আসেন—তাদের প্রতিটি গতি, তাদের প্রত্যেকটি সাজ-সজ্জা চিত্রপটের সঙ্গে মিলিয়ে দেন। এই ভাবে নাটকের কথাগুলির চিত্র-রচনা সম্পূর্ণ হলে—তিনি সুদক্ষ শিল্পীর সামনে সেই নমুনাটি তুলে ধরেন। দৃশ্য-শিল্পী তাই দেখে দৃশ্য রচনা করেন, পরিচ্ছদ নির্ম্মাতা পরিচ্ছদ তৈরী করেন।

দৃশ্য তৈরী হ'ল, পোষাক হ'ল—তবু, তখন পর্য্যন্ত, পরিচালকের চিত্রকে বলা চলে—স্বপ্ন-চিত্র। সেই স্বপ্ন-চিত্রকে মূর্ত্ত করেন অভিনেতা। নাটকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরিচালক প্রয়োজনীয় চরিত্রকে যথাক্রমে মঞ্চে নিয়ে আসেন। এইবার তিনি দৃশ্য ও মূর্ত্তিকে আলোক উদ্ভাসিত করবার দিকে নজর দেন। প্রত্যেক নাটকের চরিত্রের জন্য পোষাক এবং দৃশ্যের জন্য বর্ণবিন্যাস যেমন স্বতন্ত্র ধরণের হবে—আলোক নিয়ন্ত্রণ কৌশলও হবে তেমনি সেই নাটকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিজস্ব। নাটকের মূল-সুরের সঙ্গে সমতা রক্ষা করেই রঙ, পোষাক ও আলোক নির্ব্বাচন করতে হবে।

অনেকে প্রশ্ন করবেন—পরিচালককে কি তা হলে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত কিছুই অনুসন্ধিৎসু বিদ্যার্থীর মত অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে? আলোক শিল্পীকে তিনি কি বলে দেবেন—এখন মধ্য-দিনের সূর্য্য উঠেছে; সুতরাং তার আলোর গতি এবং ব্যপকতা হবে ঠিক এই ধরণের ?···এ প্রশ্নের জবাব,—পরিচালক কখনও প্রাকৃতিক আলোককে যথাযথ ভাবে অনুকরণ করবার চেষ্টা করেন না। সে চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র। তিনি জানেন—প্রকৃতি কখনও মানুষের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে ধরা দেয় না এবং তাকে সম্পূর্ণ ভাবে অনুকরণ করতেও দেয় না। তিনি প্রকৃতির দেখা দেখি আর একটি নূতন প্রকৃতির রাজ্য সৃষ্টি করবার স্পর্দ্ধা রাখেন না—তাঁর কল্পনার রূপলোককে তিনি আলোকোজ্জ্বল করেন···প্রকৃতি থেকে বেছে নেওয়া কয়েকটি জীবন্ত উজ্জ্বল রূপের ইঙ্গিত দ্বারা।

সাধারণতঃ মঞ্চে যে ভাবে আলোক সম্পাত করা হয়—সে বিষয়ে আলোচনা করতে হলে সবার আগে লক্ষ্য পড়ে, পাদপ্রদীপ বা

foot light এর ওপর। কেন মঞ্চের সামনে কতকগুলি foot light সাজিয়ে রাখা হয়? ওভাবে অভিনেতার পায়ের সামনে এক সার আলো বসিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা কি? যাঁরা মঞ্চের আলোক-সম্পাত প্রথার সংস্কার করতে চেয়েছেন, তাঁদের সকলের মনেই এই প্রশ্নটি জেগেছে—কিন্তু এর জবাব পাননি; তার কারণ, এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। আলোক সম্পাতের উন্নতি করতে হলে—সর্ব্ব প্রথম কাজ হ'ল—ঐ foot light এর সার মঞ্চ থেকে তুলে দেওয়া। কেউ কেউ বলেন, foot light না থাকলে অভিনেতার মুখের নীচে ছায়া পড়ে' দেখতে অত্যন্ত বিশ্রী হবে। একটু ভেবে-চিন্তে অন্যদিক থেকে আলোক সম্পাত করলে…অনায়াসে সে ছায়া দূর করে দেওয়া যায়। অভিনেতাদের অনেকের অভিমত… foot light সরিয়ে দিলে দর্শকেরা তাঁদের মুখের ভাবাভিব্যক্তি দেখতে পাবেন না। Sir Henry Irving অথবা Elenora Duse এ কথা বললে, তবু তার খানিকটা মানে হত। সাধারণ অভিনেতাদের মুখে আবার ভাবাভিব্যক্তি কোথায়? তাঁদের কারু মুখে থাকে অভিব্যক্তির বাড়াবাড়ি; আবার কারুর মুখ একেবারে অভিব্যক্তি-বর্জ্জিত পটুয়ার ছবির মত। ভাবাভিব্যক্তির কথা যদি তাঁরা তোলেন, তাহ'লে শুধু foot light কেন…তাঁদের অভিনয়ের সময় সব কটা আলো নিবিয়ে দিতে পারলে ভালো হত।…প্রসঙ্গক্রমে, foot lightএর সূচনা সম্বন্ধে M. Ludovic Celler যে অভিমত পোষণ করেন, তার উল্লেখ করা যেতে পারে। আগের কালে প্রকাণ্ড সব আলোর ঝাড় মঞ্চর ওপর দিকে টাঙিয়ে দেওয়া হ'ত… অভিনয় কালে ওপর থেকে সেই আলো অভিনেতার মাথার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ত। M. Ludovic Celler বলেন: ছোট ছোট রঙ্গমঞ্চগুলি অত দামী আলোর ঝাড় কিনে ব্যবহার করতে পারত না; তাই তারা মঞ্চের সামনের

দিকে অর্থাৎ অভিনেতাদের পায়ের সামনে সারি সারি মোমবাতি জ্বালিয়ে দিত। সেই থেকে হ'ল foot lightএর জন্ম।

দৃশ্য, পোষাক এবং আলোক নিয়ন্ত্রণের কথা ছেড়ে দিয়ে—এইবার জীবন্ত মূর্ত্তিগুলির কথা এবং কাজ কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে—সেই আলোচনায় আসা যাক্। জীবন্ত মূর্ত্তি অর্থাৎ অভিনেতাকে নিয়ন্ত্রিত না করলে—পরিচালক এত চিন্তা, এত সাধনার পর যে পূর্ণাঙ্গ চিত্র রচনা আরম্ভ করেছেন—অভিনেতা নিজের অজ্ঞাতসারেই তা নষ্ট করে দেবেন। অভিনেতার অসুন্দর কিছু সৃষ্টি করবার ঝোঁক তা বলছি না :—পরিচালক যে ভাবে রেখাঙ্কন করেছেন—যেটুকু সীমার মধ্যে থাকলে সৌন্দর্য্য পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে—সে সীমারেখা অভিনেতাকে দেখিয়ে না দিলে, বুঝিয়ে না দিলে—তিনি তো সীমার বাইরে চলে যাবেনই। যিনি যত বড় অভিনেতা বা অভিনেত্রী হবেন—পরিচালকের নির্দ্দেশ তাঁকে তত বেশী করে মানতে হবে। কারণ, বড় অভিনেতা বা অভিনেত্রীরাই—পরিচালক মঞ্চ-চিত্রের যে নক্সা তৈরী করেন—তার মাঝখানে থাকেন···তাঁরা একটুখানি নক্সার বাইরে গিয়ে পড়লেই—সর্ব্বনাশ! অভিনেতা নিজের অনুভূতি দ্বারা এক মুহূর্ত্ত চালিত হবেন না; তিনি চলবেন সমগ্র নাটকীয় রূপের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে—ঐক্য বজায় রেখে।

অনেকে ভাববেন: অভিনেতা কি তা হ'লে পরিচালকের হাতের পুতুল মাত্র! অনেক অভিনেতার মনেও, পরিচালক যখন তাঁদের নিয়ন্ত্রিত করেন—তখন এ প্রশ্ন জাগে। তাঁরা মনে করেন: সূতো ধরে যেমন করে পুতুলকে নাচানো হয়—পরিচালকও তাঁদের সেইভাবে নাচাচ্ছেন। এই মনোভাবের সৃষ্টি হয় বলেই—তাঁরা আহত, ক্ষুব্ধ হন্। মনের ভেতর অসন্তোষের ধোঁয়া জমে ওঠে বলে—তাঁদের চরিত্র রূপায়ণও সার্থক

হয় না। সীমার মধ্যে থেকেও তাঁরা কতখানি স্বাধীন, নিজ নিজ শক্তির বিকাশ তাঁরা কতখানি দেখাতে পারেন—সে বিষয়ে তাঁদের কোনো ধারণা নেই বলেই—এই অসন্তোষের সৃষ্টি।

কোনও জাহাজের কথা ভাবুন। জাহাজে অনেক সুদক্ষ কর্ম্মচারী ও যন্ত্র-নায়ক থাকেন। নিজ নিজ যন্ত্রের পরিচালনায় তাঁদের নৈপুণ্য অপরিসীম। কিন্তু তবু তাঁরা কেউ ক্যাপ্টেন (Captain) এর নির্দ্দেশ ব্যতীত কোন কাজ করেন না। ক্যাপ্টেন যখন যেভাবে তাঁদের নিজ নিজ যান্ত্রিক বিভাগ পরিচালনা করতে নির্দ্দেশ দেন—তাঁরা ঠিক সেইভাবে কাজ করে যান—এবং কাজ করেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়। স্বেচ্ছায় কারুর বশ্যতা স্বীকার করবার নামই হ'ল—Obedience বা বাধ্যতা। বহু কর্ম্মী, বহু যন্ত্রীকে নিয়ে রঙ্গমঞ্চ; তাকেও তুলনা করা যায়, জাহাজের সঙ্গে। মঞ্চেও প্রয়োজন ঠিক ঐ ধরণের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত বশ্যতা স্বীকার। জাহাজের কর্ম্মীদের মধ্যে অসন্তোষ বা অবাধ্যতার সৃষ্টি হলে কঠোর হস্তে শাসনের ব্যবস্থা আছে; রঙ্গমঞ্চে তা নেই। মঞ্চের সমস্ত বিভাগের, সমস্ত শিল্পীর মনে···তাদের দায়ীত্ব, তাদের বশ্যতা স্বীকারের গুরুত্ববোধ জাগ্রত থাকা একান্ত আবশ্যকীয়।

অবশ্য মঞ্চ-শিল্পীদের অন্তরের মাধুর্য্যের তুলনা হয় না। তাঁরা পরিচালকের অবাধ্য হন শুধু তখনই—যখন তাঁদের বিচার-বুদ্ধিতে ভুলের সূত্রপাত হয়। যুদ্ধ-জাহাজের কোন কর্ম্মী শত্রুর সঙ্গে গোপনে যোগ দিলে—গোটা জাহাজখানা বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। বিচারবুদ্ধির দোষে মঞ্চের কোন একজন শিল্পীও যদি শত্রুপক্ষের সঙ্গে সামান্য যোগাযোগ স্থাপন করেন—তাহ'লে মঞ্চের শিল্পকলা সৃষ্টির প্রয়াসও তেমনি বিপন্ন হয়ে পড়ে। মঞ্চের শত্রু কে?—মঞ্চের শত্রু—নিম্ন শ্রেণীর

অভিনয়, নিম্ন স্তরের জনমত, এবং দম্ভপূর্ণ মূঢ়তা। এই তিনটি শত্রুই বেশীর ভাগ শিল্পীকে বশীভূত করতে চেষ্টা করে।

অভিনেতাদের মধ্যে কেউ নাট্যপরিচালনা করতে পারেন কিনা—এর জবাবঃ না, করা উচিত নয়। জাহাজের কোন যন্ত্র-দক্ষকে যদি ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত করা হয়,—তা হ'লে তিনি শুধু ক্যাপ্টেন হিসাবে কাজ করবেন, নিজের হাতে যন্ত্র ঘোরাবেন না, দড়ী টানবেন না। তেমনি, একসঙ্গে অভিনয় ও নাট্যপরিচালনা করা উচিত নয়। যদি কোনো অভিনেতা নাট্যপরিচালক হন—তা হ'লে একথা খুবই স্বাভাবিক, যে···তিনি নিজেকেই সকলের কেন্দ্রস্থলে রাখবার চেষ্টা করবেন। নাটকের জন্য তিনি থাকবেন না,—নাটক থাকবে তাঁকেই ঘিরে। সমগ্রভাবে নাটকের রূপ কল্পনার পরিবর্ত্তে···তিনি তাঁর নিজের গৃহীত অংশটীকে সর্ব্বপ্রধান করে তুলতে চাইবেন। নাটকের ঐক্য-ব্যাহত হবে, রস সৃষ্টির সমস্ত প্রচেষ্টা ক্ষুণ্ণ হবে। নিজে অভিনয় করবেন এবং সেই সঙ্গে নাটকের সকল দিক্‌কার ঐক্য বজায় রাখবেন—তেমন অভিনেতা-পরিচালক কেউ হতে পারেন কি না জানি না। নাট্যকারও পরিচালক হতে পারেন না; তার একটী প্রধান কারণ—তিনি থাকেন স্বতন্ত্রজগতে; তাঁর রক্তের সঙ্গে মঞ্চের সংস্কার মিশ্রিত থাকে না। নাট্যকার যখন অভিনয়, দৃশ্য রচনা, আলোক নিয়ন্ত্রণ এবং নৃত্যশিল্পের বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন করেন—শুধু বই পড়ে নয়, মঞ্চজগতের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত থেকে—একমাত্র তখনই হ'তে পারেন তিনি নাট্য-পরিচালক। কিন্তু নাট্যকারের পক্ষেও এ কাজ অত্যন্ত দুরূহ।


আমাদের মঞ্চ

গিরিশচন্দ্র ও নাট্যমঞ্চ

ভরতের নাট্যশাস্ত্র…সংস্কৃত যুগের রঙ্গালয়…তার সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের সম্বন্ধ নেই। প্রাচীনকালে যে নাটক ও রঙ্গালয় গড়ে উঠেছিল কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবির বিরাট প্রতিভার সংস্পর্শে—সে যুগের সে নাট্য-রসধারা যদি বহতা নদীর মত বয়ে আসতে পারতো কালের পরিধি অতিক্রম করে—তা হলে হয় তো আমাদের রঙ্গজগতকে রস-সমৃদ্ধ করতো—সেই গতিশীলা, বহমানা, বিচিত্ররূপা রস-প্রবাহিনী। পাহাড়, পর্ব্বত পেরিয়ে, দেশের পর দেশ পিছনে ফেলে যে নদী বয়ে চলেছে—তার গতি পরিবর্ত্তন, রূপ-বিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানব মন-ভূমিতে অবতরণ করে…বিচরণ করে…বহু সঙ্ঘাতের ভিতর দিয়ে অতীত যুগের সে নাট্য-রসধারাও আজকের যুগে সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতো…কিন্তু তবুও তাকে বলতুম আমরা সংস্কৃত নাটকেরই দুহিতা। ব্যাকরণের সন্ধি সূত্রের নাগপাশে বেঁধে দিয়ে সংস্কৃতকে করা হ'ল "মৃত ভাষা"!…অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনকে বিধিনিষেধে আবদ্ধ করে দেওয়া হল; নদীর প্রবাহ বাধা পেল…সেখানেই হ'ল তার সমাপ্তি! তাই কালিদাসের সৃষ্টিকে আজ আমরা দূর হতে সবিস্ময়ে দেখি…তাজমহলের মত সে যেন এক মর্ম্মর সৌধ! বিধিনিষেধের গণ্ডীতে সংস্কৃত ভাষাকে বেঁধে না দিলে…কালিদাসের কাব্যপ্রতিভা যুগে যুগে নূতন মূর্ত্তি নিয়ে দেখা দিত আমাদের নাট্য-সাহিত্যে—আমাদের জাতীয় প্রমোদ-ক্ষেত্রে।

সংস্কৃত যুগের সঙ্গে আমাদের নাট্য-সাহিত্যের একটী ধারা শেষ হয়ে গেল। তারপর এক বিরাট অন্ধকার যুগ! বহু শতাব্দীর ব্যবধান! মুসলমান শাসনকালে যে কারণেই হোক নাট্য-সাহিত্যের নূতন করে পত্তন হল না…বিকাশ হ'ল না।…তারপর এল ইংরেজ আমল।

শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীগণ, হয়তো খানিকটা স্বার্থ-প্রণোদিত হয়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্ম দেশের জনগণের মধ্যে প্রচারিত হবে···এই আশা নিয়ে, বাংলা ভাষার চর্চ্চায় মনোযোগ দিলেন···দেশে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের প্রচলন হ'ল। পরোক্ষভাবে তার ফলে বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন হ'ল···দেশে নূতন নূতন প্রতিভার বিকাশ হ'ল। বাংলা ভাষার উন্নতির মূলে যেমন ছিল এই খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টা,—বাংলা নাটকের নূতনভাবে পত্তন হয়েছিল সেও এই বিজাতীয়দের সংস্পর্শে এসে। এঁরাই এদেশে Shakespeare-এর নাটকাভিনয় কর্লেন···এঁদের দেখাদেখি সংস্কৃত নাটক অনূদিত হয়ে অভিনীত হল···নূতন বাংলা নাটক রচনার প্রেরণা এল···নাট্যশালা স্থাপনের উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ হ'ল। যাঁরা এই নাট্যসাহিত্য রচনা ও রঙ্গশালা স্থাপনের উদ্যোক্তা···তাঁদের কাছে আমরা চির-ঋণী সন্দেহ নাই···কিন্তু ব্যাপকভাবে, স্থায়ীভাবে, বিরাট সম্ভাবনাময় বঙ্গীয় রঙ্গশালার প্রধান স্থাপয়িতারূপে আজ আমরা প্রণাম করি মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে। পূর্ব্ববর্ত্তীগণ এনেছিলেন কল্পনা···এনেছিলেন উপাদান···গিরিশচন্দ্র নির্ম্মাণ করলেন বাংলার স্থায়ী নাট্য-মন্দির।

নাট্যচার্য্য বা নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা বিচারের পরিসর এ প্রবন্ধে নেই। গিরিশচন্দ্র স্থাপিত বাংলার নাট্যশালা আজ পর্য্যন্ত কতখানি অগ্রগামী হয়েছে, তারই সামান্য আলোচনা করিতে চাই এখানে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নাটকীয় ভাবধারায় এবং technique-এর দিক দিয়ে প্রধানতঃ Shakespeare-কে অনুসরণ করেছেন। ভাবের দিক দিয়ে বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটকগুলি অনেকটা Shakespeare-এর নাটকেরই অনুসরণে রচিত। Technique-এর দিক হতে বরং খানিকটা সে যুগ ছাড়িয়ে অগ্রসর হয়েছে···স্বগতোক্তি, সুদীর্ঘ

dialogue, কাব্যের বাহুল্য অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং অভিনয়ের সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে সাধারণতঃ আড়াই ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে। সামাজিক নাটকের প্রতি এখনকার দর্শকদের আকর্ষণ পূর্ব্বযুগ অপেক্ষা অনেকটা বেশী হয়েছে। Technique-এর দিক হ'তে বর্ত্তমানের সামাজিক নাটকগুলির কতকগুলিকে Shakespeare-এর technique-এরই পরিমার্জ্জিত সংস্করণ বলা চলে; আবার দু'চারখানা Ibsen-এর নাট্যগঠন পদ্ধতি অনুসরণেও রচিত হয়েছে। সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রেও অভিনয়ের সময় সংক্ষেপ করা হয়েছে। গিরিশ যুগের অভিনয় ধারার খানিকটা পরিবর্ত্তন হয় নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের আবির্ভাবে। শিশিরকুমারের নাট্য-মন্দির স্থাপনার সঙ্গে এবং আর্ট থিয়েটারের প্রচেষ্টায় নাটকের প্রয়োগপদ্ধতিরও খানিকটা উন্নতি হয়। "এলিজাবেথান" যুগের ভেলভেটের পোষাক, পটে আঁকা scene প্রভৃতি বহুলাংশে বর্জ্জন করা হয়েছে; রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থপতি অনেকখানি প্রাধান্য পেয়েছে। আমেরিকা-প্রত্যাগত সতু সেন রঙ্গমঞ্চে আলোক সম্পাতের উন্নত-প্রণালী প্রবর্ত্তন করেছেন—বিশেষ করে "ঝড়ের রাতে" এবং "বিষ্ণুপ্রিয়া" নাটকে আলোক সম্পাত সত্যই প্রশংসনীয়।···দুঃখের বিষয়, নবযুগ প্রবর্ত্তক শিশির-প্রতিভা আজ অস্তোন্মুখ···এবং আরও দুঃখ এই যে—বড় অসময়ে, বড় অতর্কিতে অস্তোন্মুখ।···তার জন্য দায়ী কে—সে বিচার কর্ব্বার ক্ষেত্র এ নয়।··· এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শুধু রঙ্গমঞ্চের বর্ত্তমান পরিস্থিতি আলোচনা। শিশিরকুমারের পর এমন কোনো বড়ো প্রতিভা বাংলা রঙ্গজগতে আসেনি—যাকে যুগ-স্রষ্টা বলা চলে। তাই, এখনকার রঙ্গমঞ্চের tendency অনেকটা ··নিছক "teamwork"-এর দিকে। নাটকে যদি কিছু বস্তু থাকে এবং অভিনয়ে যদি "team-work" থাকে—তবেই দর্শকেরা সন্তুষ্ট। তাই বর্ত্তমান রঙ্গজগতকে "গণ-তান্ত্রিক" বলা চলে।

এখন মোটামুটিভাবে ভেবে দেখা যাক্—গিরিশ-যুগে যে রঙ্গশালার স্থাপনা হল—এতদিনে তা কতখানি রূপ-পরিবর্ত্তন করেছে। নাটকের দিক দিয়েই বলুন—বা অভিনয়ের দিক দিয়েই বলুন—আমার বিশ্বাস, বঙ্গীয় রঙ্গশালা "এলিজাবেথান" যুগ ছাড়িয়ে খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। যেটুকু পরিবর্ত্তন হয়েছে তা নিছক্ যুগ-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন—প্রতিভার সংস্পর্শে এসে নয়। বিদেশী নাটক অনুসরণে বাংলা নাটকের সূচনা; কিন্তু যেখানে আমরা এগিয়ে এসে Ibsenকে অনুসরণ কর্চ্ছি—techniqueএর সঙ্গে বেমালুম অনুসরণ কর্চ্ছি···Ibsen-এর ভাবধারাকে! আর, নাটকের অভিনয় এবং প্রয়োগপদ্ধতি? ওদেশের মনীষা আজ এতদূর এগিয়ে এসেছে যে, তাদের মনে সন্দেহের সূচনা হয়েছে রক্ত-মাংসের মানুষ সত্যিকারের অভিনয় করতে পারে কি না—এই নিয়ে! মানুষ-অভিনেতার ব্যক্তিগত সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, হর্ষ, বিষাদ রয়েছে; তাই নাটকীয় চরিত্রের রূপদান কালে তার শরীরের মাংসপেশী, তার অন্তরের ভাবাভিব্যক্তি······হয়তো প্রতি অভিনয় রজনীতে নাটকের প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে না। ব্যক্তিগত সুখ, দুঃখ প্রভৃতি হবে তার চরিত্র রূপায়ণের অন্তরায়। তাই না Gordon Craig পরিকল্পনা করলেন "Uber marionette"-এর! মানুষ অভিনেতার স্থান অধিকার কর্ব্বে "কাঠের পুতুল"। অনেকে বলল—Craigকে পাগল। জগতের শ্রেষ্ঠ মণীষা—যারা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্ব্বোধ্য—তাঁদের অনেক সময় পাগল আখ্যা পেতে হয় বৈকি! G. Craig এর পরিকল্পনার কথা আমি এখানে উল্লেখ করলুম শুধু এইটুকু দেখাতে, যে···য়ুরোপীয় রঙ্গজগত আজ সৃষ্টির নব নব প্রেরণায় কতখানি চঞ্চল! আর আমরা?

রঙ্গজগতের উন্নতির জন্য বহুল পরিমাণে আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে—যাঁরা এ বিষয়ে মাঝে মাঝে প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন—তাঁরা কেউ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন্! এবং যাঁরা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত থাকেন—তাঁরা ভুলেও একবার এ বিষয়ে আলোচনা করা দূরে থাক্—যে সব প্রবন্ধাদি অন্য লেখকেরা লিখে থাকেন, সেগুলিও পড়ে দেখবার অবকাশ পান না। কাজেই, রঙ্গমঞ্চের অবস্থা রইল সেই এক প্রকার।

গিরিশচন্দ্র ইংরেজী নাট্যশালার অনুসরণে যে নাট্যশালার স্থাপনা করেছিলেন—ইংরেজীর অনুকরণবৃত্তি তার ভেতর বর্ত্তমান থাকা স্বাভাবিক। সংস্কৃতযুগে এখন আর ফিরে যাওয়া চলে না; আমাদের নাট্যশালাকে চলতে হবে···বিদেশীয় রঙ্গজগতের দিকে লক্ষ্য রেখে। বিলাতি ফুল এদেশে আমদানী হয়েছে ক্ষতি নেই; কিন্তু টবে পুঁতে রাখলে তার আয়ু কতদিন? দেশের মাটীতে তাকে বসিয়ে দিন, বাংলার মাটী থেকে তা রস-সংগ্রহ করুক। তারপর হয়তো একদিন দেখতে পাবেন—সে গাছে যে ফুল ফুটেছে, তা আর খাঁটী বিলাতি নয়। বাংলার মাটীর রসে, বাংলার সজল স্নিগ্ধ পরিবেষ্টনীর মধ্যে, এক নূতন ধরণের পুষ্প-স্তবকে সে গাছ ছেয়ে গেছে। তখন তাকে বাংলার নিজস্ব ফুল বললে কি নিতান্তই অন্যায় বলা হবে?

দেশ ও নাট্যমঞ্চ

বিলাতি থিয়েটারের অনুকরণে বাংলাদেশে রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছে। তাই অনেক কাল পর্য্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানী জামা, কাপড়, সৌখীন আসবাবপত্র প্রভৃতির সামিল ধরা হ'ত—রঙ্গালয়কে। ও যেন কেবল সৌখীন সম্প্রদায়ের নিছক বিলাসের ক্ষেত্র। তাই, স্বদেশী ভাবের প্রেরণা যখন এদেশে জাগল—রঙ্গালয়কেও বিদেশী মালের মত বর্জ্জন করবার একটা ধূয়া উঠল। বড় বড় কংগ্রেসনেতা জেলে যেতে সুরু করলেন—বিলাতী কাপড়ের সঙ্গে থিয়েটারের সামনেও অমনি "পিকেটিং" আরম্ভ হল। অনেক ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে; কলকাতা থেকে আমাদের দেশে মেলায় থিয়েটার গেছে। কত নামজাদা অভিনেতা, অভিনেত্রী গেছেন; তাদের অভিনয় দেখব বলে আনন্দে, উত্তেজনায় চার পাঁচ রাত ভাল ক'রে ঘুমুতে পারিনি! যেদিন অভিনয় সুরু হ'বে···সেদিন সকালবেলা আমাদের শহরের একজন কংগ্রেস-নেতা ধরা পড়লেন! আর যাবে কোথায়? সমস্ত স্কুলের ছেলেরা এবং তা'দের পাড়ার উদ্যোগী দাদার দল ছুটলেন···মেলায় থিয়েটার বন্ধ করে দিতে। "বন্দেমাতরম্", "গান্ধিজী কি জয়" ধ্বনি তুলে আমিও এসে যোগ দিলুম তাদের দলে। তারপর সে কি পিকেটিংএর ধুম! ফলে থিয়েটার-ওয়ালাদের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে কলকাতায় ফিরে আসতে হ'ল। যে দু'চারজন চেনা ছেলে পিকেটিং অগ্রাহ্য করে থিয়েটার দেখেছিল—তাদের আমরা মনে করলুম দেশের পরম শত্রু বলে। থিয়েটার দেখার মহা অপরাধে তাদের আমরা যে দণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলুম—অপরাধ করে জেলে গেলেও জেল-কর্তৃপক্ষ তার চেয়ে অধিক শাস্তি তাদের দিতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

থিয়েটার উগ্র-গন্ধী বিদেশী বস্তু, এই যে অদ্ভূত মনোভাব···এ অবশ্য কালের গতির সঙ্গে অনেকটা পাল্টে গেছে। কিন্তু তা হ'লেও এখন



শ্রীমতী সাবিত্রী



শ্রীমতী পূর্ণিমা

পর্য্যন্ত থিয়েটার দেশের মাটীতে তার ভিত্তি স্থাপন করতে পারেনি। জাতির উন্নতি ও অবনতির মান-যন্ত্র হ'ল জাতির রঙ্গালয়; জাতির চিন্তাধারা কোন্ পথে চ'লেছে—তা রঙ্গালয় এমন প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিতে পারে, যা নাকি অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে প্রথম থিয়েটার স্থাপিত হয়েছিল বিলাতী থিয়েটারের অনুকরণে, একথা আগেই বলেছি। কয়েকজন মিশনারী ও ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোক বিলেতে রঙ্গালয় আছে, তাই দেখে এদেশেও রঙ্গালয় স্থাপনার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই হ'ল থিয়েটারের আদিপর্ব্ব। কিন্তু তাই বলে থিয়েটার দেশের নিজস্ব বস্তু হতে পারে না, এ ধারণা বড়ই অদ্ভুত। তাকে গঠন করে নিতে হবে স্বদেশীয় ভাব দিয়ে···সভ্যতা দিয়ে···সংস্কৃতি দিয়ে। তারপর দেখতে পাবেন—থিয়েটারের ভেতর দিয়ে দেশ-সেবার, জাতি গঠনের, কি বিরাট সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে।

আমাদের গোড়ার গলদ কোথায় জানেন? আমাদের দেশে দর্শক সমাজ এককালে যেমন থিয়েটারকে বিদেশী জিনিষ মনে করতেন—যাঁরা থিয়েটার পরিচালনা করতেন বা থিয়েটারের সঙ্গে অন্য দিক দিয়ে সংশ্লিষ্ট থাকতেন···তাঁরাও অনেকটা ওই ভাব পোষণ করতেন। স্বদেশীযুগে বিলাতি মালের দোকানদারের মত তাঁরাও সর্ব্বদা তটস্থ থাকতেন,—পেটের দায়ে যেন দেশের কাছে অপরাধ-মূলক কাজ কর্চ্ছেন···অনেকটা এই রকম ভাব। নাট্যশালার বিরাট দায়িত্ব, জাতিগঠনের অপরিসীম সম্ভাবনার পরিকল্পনা করা দূরে থাক—তাঁরা রঙ্গালয়কে সত্যি সত্যিই করে তুললেন ধনিকের বিলাস কেন্দ্র।

আত্ম-বিস্মৃত রঙ্গালয়ের এমন অবনতি ঘটল, যে⋯নৈশপানাগারে যে বীভৎস উল্লাসে মদমত্ত নর-পশু মেতে ওঠে⋯রঙ্গালয় যোগাতে লাগল অনেকটা সেই স্তরেরই প্রমোদ-বিলাস! অবশ্য মহাকবি গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ দু'চার জন তাঁদের নাট্য-সাহিত্য ও সাধনা দিয়ে রঙ্গালয়কে এই দূষিত আব-হাওয়া থেকে অনেকটা উন্নত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। আর, ওঁদের প্রচেষ্টা না থাকলে অনেক আগেই বাংলার রঙ্গালয়ের অপমৃত্যু ঘটত। কিন্তু তবু একথা সত্যি, যে, আজ পর্য্যন্ত বাংলার রঙ্গালয়গুলি সর্ব্বতোভাবে বাঙালীর রঙ্গালয় হতে পারে নি। তার কারণ রঙ্গালয়কে জাতির প্রাত্যহিক জীবনক্ষেত্র থেকে বরাবর আলাদা করে দেখা হচ্ছে: রঙ্গালয় শুধু প্রমোদ-গৃহ হয়ে থাকছে! শুধু রঙ্গ, তামাসা! দু' ঘণ্টা নাচে, গানে, বর্ণবৈচিত্র্যের মাঝখানে খানিকটা আপনা ভুলে থাকবার যায়গা—ব্যস্, এই পর্য্যন্ত!

বাঁচতে হ'লে মানুষের খানিকটা আমোদ প্রমোদের দরকার বৈকি। প্রাণ খুলে হাসতে পেলে জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি পায়, এমন কথাও শোনা যায়। তাই রঙ্গালয়ের খানিকটা প্রমোদ বিতরণের জন্যও বেঁচে থাকা দরকার। তবে কি জানেন, আসল কথা হল, রঙ্গালয় যে বর্ণ-বৈচিত্র্যে আমাদের মনের ওপর প্রলেপ দেবে—সে যেন আমাদের মনকে বিকৃত না করে বরং খানিকটা ঔজ্জ্বল্য দান করে।

নিছক আনন্দ পরিবেশনের জন্য রঙ্গালয়ের এই যে প্রয়োজনীয়তা, সে-ও কেবল দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে; আর রঙ্গালয়ও প্রমোদ বিতরণের দায়িত্ব নিতে পারে তখনই⋯যখন সে তার নিজের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে পেরেছে। কারণ, প্রমোদ পরিবেশন বড় কঠিন ব্যাপার;

অত্যন্ত হুঁসিয়ার হয়ে না চললে···প্রমোদ থেকে প্রমাদ ঘটতে বিলম্ব হয় না। জাতি যখন সুস্থ···রঙ্গালয় যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিকার-মুক্ত···শুধু সেই অবস্থাতেই নিছক আনন্দের পারস্পরিক আদান প্রদান হতে পারে। অন্য অবস্থায় নয়।

বিশেষতঃ দেশের বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতি! এ সময়ে শুধু বিমল আনন্দ-পরিবেশনের উদ্দেশ্য নিয়ে রঙ্গালয় পরিচালনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত দুর্গত নরনারী অন্নাভাবে যে দেশে হাহাকার করছে, সে জাতির জীবনে বিমল আনন্দ-সম্ভোগেরই বা অবকাশ কোথায়? আগে দেশকে বাঁচাতে হবে, জাতিকে বাঁচতে হবে—জাতি সুস্থ সবল হলে—তখন তো আনন্দ-সম্ভোগ! তাই আজ রঙ্গালয়কে যদি বাঁচতে হয়—তাকে জাতির দুঃখদুর্দ্দশার অংশ নিয়ে বাঁচতে হবে—জাতিকে আশ্বাস দিতে হবে, সাহায্য করতে হবে, মৃত্যুর মুখ হতে জাতিকে ফিরিয়ে আনবার জন্য দেশব্যাপী প্রেরণা জাগাতে হবে। রঙ্গালয় প্রত্যক্ষভাবে যে আবেদন উপস্থিত করতে পারে—হাজার সভা সমিতি তা পারে না। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, দেশের সমস্ত দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত হয়ে—রঙ্গালয় যদি দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে—তাহ'লেই আজ রঙ্গালয়ের বাঁচবার সার্থকতা আছে। নতুবা—আজ একথা বলা অন্যায় হবে না, যে··· প্রমোদ-সর্ব্বস্ব রঙ্গালয়—আজ দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর আহার্য্য অপহরণ করে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেই শোষণকারী রঙ্গালয়কে আপনারা ধ্বংস করুন—জাতির দেহে বিষদুষ্ট ক্ষতের ন্যায় তাকে বর্জ্জন করুন।

নাট্যকার ও নাট্যমঞ্চ

প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়, বাংলা রঙ্গমঞ্চে ভালো নাটকের অভাব। তা যদি হয়, তার জন্য দায়ী কে? নাট্যকারের রচনা শক্তির দৈন্য কিম্বা রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষের নাটক নির্ব্বাচনে দূরদৃষ্টির অভাব? নাট্যকার হিসেবেও বটে এবং রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে—আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিক হ'তে…আমি এ সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলতে চাই।

রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য যে সব নাটক আসে—তার শতকরা নব্বই থানারও বেশী আসে—অতি অক্ষম লেখকের নিকট হ'তে—যাদের কাছে এতটুকু নাট্য-রস-বোধের আশা করা দূরে থাক—ভাষাজ্ঞান পর্য্যন্ত যাদের নেই। রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহে হাজার হাজার দর্শক নির্ম্মম বিচারকের মত বসে রয়েছেন—এতটুকু অভাব বিচ্যুতি তাঁরা ক্ষমার চক্ষে দেখবেন না…তাঁদের বিচারের মানদণ্ডে তাঁরা নাট্যকারের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে যাবেন—(কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নাট্যকারের অনেক সময় ধারে ব্যবসা হয় বটে, কিন্তু মজা এমনি, দর্শকগণ নাট্যকারের পাওনা মেটান অভিনয়ের প্রতি অঙ্কে, নাটকের প্রতিটি কথা ওজন করে)। যেখানে হাজার হাজার জীবন্ত মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে—"লেন-দেন", অবাক হই এই ভেবে, যে…সেই নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টিকেই যেন তথা-কথিত লেখক-গোষ্ঠী ভাবেন সবচেয়ে সহজ-সাধ্য সাহিত্য সাধনা!

যাঁরা ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক বা প্রবন্ধ-রচয়িতা রূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, তেমন প্রতিভাবান লেখকের নিকট হ'তে যে মাঝে-মাঝে দু'একখানি নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্যে না আসে এমন নয়। তাঁদের কয়েকজনের নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীতও হয়েছে, এবং রঙ্গমঞ্চের

কর্তৃপক্ষ লাভবানও হয়েছেন—সে নাটকের অভিনয়ে। কিন্তু তবু শক্তিমান সাহিত্যিকের রচিত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের সংখ্যা খুবই সামান্য। রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষের নাটক নির্ব্বাচনে সুবিবেচনার অভাব বা গতানুগতিক পথে চলবার প্রবৃত্তিই নাকি সাহিত্যিক গোষ্ঠীকে রঙ্গমঞ্চ থেকে দূরে রেখেছে—অনেকে এমন অভিযোগও করেন শুনতে পাই। কিন্তু এ অভিযোগের মূলে কতখানি সত্য আছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। দেশে এমন অনেক কথা-শিল্পী আছেন—যাঁদের রচনাভঙ্গী, চরিত্রসৃষ্টি কৌশল···অতি উচ্চস্তরের। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁদের আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি···তাঁদের লেখা গল্প, উপন্যাস পড়ে প্রচুর আনন্দ পাই। তাঁদের লেখার ভেতর যে ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, অনেক সময় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকে সেই ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনাই হয় প্রধান অন্তরায়। কথাটা শুনতে হয়তো একটু অদ্ভুত লাগছে! এর মানে এই নয়, যে···নাট্যকারকে ব্যক্তিত্বহীন হতে হ'বে···। তাঁর ব্যক্তিত্ব সর্ব্বাংশে থাকবে প্রচ্ছন্ন। ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হ'লেই—সেখানে এসে যায় আত্ম-মত-বাদ। ব্যক্তি বিশেষের মতবাদ শোনবার মত পাঠকের অভাব হয়তো বাংলাদেশে নেই···কিন্তু রঙ্গমঞ্চের দর্শক সাধারণ সেভাবে এখনো তৈরী হয়নি। এবং সত্যিকথা বলতে কি···উপন্যাসে, গল্পে, প্রবন্ধে যাঁরা লেখকের মতবাদ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন—তাঁদেরও অধিকাংশ লোক রঙ্গমঞ্চে তা ঠিক নিতে পারেন না।

তবে কি রঙ্গমঞ্চের কাজ নিছক আমোদ প্রমোদে লোককে ভুলিয়ে রাখা? তা নয়। শুধু এইটুকু আমি নিবেদন করতে চাই, যে, রঙ্গমঞ্চে যে নাটকের অভিনয় হবে সে নাটককে রঙ্গমঞ্চের "টেক্‌নিক্‌" অনুযায়ী গঠিত হতে হবে এবং দেশের সর্ব্বসাধারণের হৃদয়াবেগকে কুত্রাপি

ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। এই দু'টী দিকে লক্ষ্য রেখে শক্তিমান সাহিত্যিকেরা যদি নাটক রচনা করেন, তাহ'লে অদূর ভবিষ্যতে বাংলার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটক উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য হিসেবে নিশ্চয়ই মর্য্যাদা পেতে পারে।

এইসঙ্গে রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষকেও দু'একটী কথা বলতে চাই। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নাট্যকারকে তাঁর প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে এখনো শেখেন নি। নাট্যকার তাঁদের চক্ষে কৃপার পাত্র। ভালো নাটকের সংখ্যা খুবই কম—সে তো আগেই স্বীকার করেছি। কিন্তু যে দু'চারখানা ভালো নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে এবং রাতের পর রাত কর্তৃপক্ষের পকেট ভর্ত্তি করেছে···সেই ক'খানি নাটকের নাট্যকারকে কি তাঁরা যথাযোগ্য (টাকার কথা তো ছেড়েই দিলুম) মর্য্যাদা দিয়েছেন? নাটকে নাট্যকার নিজের কথা একবর্ণ বলতে পান্ না, কথা বলে তাঁর স্বষ্ট বিভিন্ন চরিত্র; নাট্যকার নিজে থাকেন সর্ব্বাংশে সৃষ্টির অন্তরালে। কর্তৃপক্ষও কি তাই নাট্যকারের অস্তিত্ব বেমালুম ভুলে যান? নাটকের "জুবিলি" উৎসবে আর্টিষ্ট থেকে আরম্ভ করে বিজ্ঞাপন লেখক এবং হিসেব লেখক পর্য্যন্ত মূল্যবান পুরস্কার পেয়েছেন··· অথচ নাট্যকার নিজে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সেই উৎসবে তাঁকে দু'টো মুখের কথায় পর্য্যন্ত সম্মানিত করেনি—এমন রঙ্গালয়ও এখনো এই বাংলা দেশে আছে! স্রষ্টাকে যারা সংক্ষুব্ধ করে··তাদের ভবিষ্যৎ· সম্বন্ধে যে যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে—এ কথা বলাই বাহুল্য।

কোন্ নাটক চাই ?

কোন্ শ্রেণীর নাটক এ যুগের বাঙালী দর্শকেরা চান্? কোন্ নাটক ভাল? পৌরাণিক? ঐতিহাসিক? না সামাজিক? একটা হ'ল অতীত কথা, আর একটা হ'ল বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত। অনেকে বলেন—এটা প্রগতির যুগ; আমাদের কারবার বর্ত্তমান···বিশেষ করে··· ভবিষ্যতকে নিয়ে। সুতরাং তাঁদের মতে শুধু সামাজিক নাটকই অভিনীত হওয়া প্রয়োজন। আমিও নবীনের দাবী স্বীকার কচ্ছি; কিন্তু তা' বলে প্রাচীনের দাবীকে অবহেলা কর্‌তে রাজী নই। অতীত আর বর্ত্তমান যে অচ্ছেদ্য বন্ধন-সূত্রে আবদ্ধ রয়েছে, তাকে যখন অস্বীকার করা চলে না—তখন তার প্রাপ্য শ্রদ্ধা না দিই কেমন করে! বর্ত্তমানের সবুজ পাতা আর ভবিষ্যতের রঙীন ফুলকে আদর করব; কিন্তু তা' বলে অতীতের শেকড়গুলিকে অপ্রয়োজনীয় বলে কি কেটে বাদ দেওয়া চলে?

পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক নাটকে পাই এক একটী বিরাট আদর্শ, এক একটী বিরাট ব্যক্তিত্বের সন্ধান। তাঁদের অলৌকিক কার্য্যাবলীর সঙ্গে হয়তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো ঘটনার কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। কিন্তু তা' বলে আমাদের মন কখনও বিরূপ হয় না। তার একটী কারণ—আমাদের দেশের মাটীর সঙ্গে, আমাদের সংস্কারের সঙ্গে, আমাদের রক্তের সঙ্গে—ধর্ম্মভাবের একটা বিচিত্র সংমিশ্রণ রয়ে গেছে। আর একটী কারণ;—রক্তমাংসের মানুষের ভুলভ্রান্তি আছে; সে কখনো "আইডিয়াল" হতে পারেনা; কিন্তু "আইডিয়ালে" পৌছুবার জন্যে যে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম—তাই নিয়েই মানুষের মনুষ্যত্ব। তাই আমরা নিজেরা আদর্শ না হ'লেও—আদর্শকে ভালবাসি; এবং এই জন্যই পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি আমাদের মত না হলেও, তারা আমাদের প্রিয়। এ হিসেবেও পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

আর সামাজিক নাটক? সমাজ নিয়েই মানুষের বাস সুতরাং সামাজিকের মূল্য তো আছেই। তবে বক্তব্য এই যে, যাকে সামাজিক বলে চালাব, সে যেন আমারই সমাজের প্রতিবিম্ব নিয়ে গঠিত হয়। রঞ্জনরশ্মিপাতে যেমন করে বৈজ্ঞানিক জীবদেহের আভ্যন্তরীণ ক্ষতকে ধরে ফেলেন, তেমনি করে কুশলী নাট্যকার অপূর্ব্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমাজ-দেহের সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি সুপ্রকাশিত করেন—তার সংশোধনের জন্য। এখানেই সামাজিক নাটকের সার্থকতা। তাই বলছিলুম, সামাজিক নাটক মানে, বাঙালীর পোষাক পরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে জানা সাহেব-মেমদের নিয়ে লেখা নাটক নয়। আমাদের সামাজিক নাটক বলি তাকে—যার ভেতর ভুলত্রুটি, পাপপুণ্য নিয়ে গড়া সত্যিকারের বাঙালীর জীবন-নাট্য দেখতে পাই।

তবে একটা কথা, সামাজিক বলুন কিম্বা ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক বলুন—এদের সবার মূলে রয়েছে রস-সৃষ্টি। নাটকের বিভিন্ন শ্রেণী মানে রসসৃষ্টির বিভিন্ন ধারা। সেই রসসৃষ্টি করতে হলে—মানুষের জীবন থেকে নাটকীয় মুহূর্ত্তগুলি বেছে নিয়ে তাতে খানিকটা কল্পনার রঙ ফলিয়ে নিতে হবে। সেই নাটকই রস-লিপ্সু দর্শকের কাছে প্রিয় হয়—যাতে নাটকীয় মুহূর্ত্তগুলি শিল্পীর অনুপম কল্পনার স্পর্শে বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে। প্রশ্ন করবেন—বর্ণবিন্যাসের মূল্য কি? তার সার্থকতা কোথায়? জীবনের নাটকীয় মুহূর্ত্তকে কিছুমাত্র রঙ্ না ফলিয়ে হুবহু বর্ণনা করে গেলেই তো যথেষ্ট! না···যথেষ্ট নয়। ফটোগ্রাফ আর শিল্পীর আঁকা ছবি একবস্তু নয়। অবিকল প্রতিচ্ছবি পেলেই যদি মানুষের মন তৃপ্ত হ'ত, তা হ'লে এতদিনে শিল্পীকে নামিয়ে দিয়ে তার আসনে বসত ফটোগ্রাফার।

নাট-মঞ্চের ক'টী অভাব

এই প্রবন্ধে বাংলা থিয়েটারের দু'একটী অভাব-অভিযোগের বিষয় আলোচনা করব। কল্‌কাতায় বর্ত্তমানে রঙমহল, শ্রীরঙ্গম, মিনার্ভা, ষ্টার ও কালিকা এই পাঁচটী থিয়েটার চলছে। অগুন্তি সিনেমা হাউসের তুলনায়—থিয়েটারের সংখ্যা সামান্য। অথচ সিনেমা হাউসগুলি বাংলার এবং হালে বোম্বাই অঞ্চলের ছবি দেখিয়ে বেশ দু' পয়সা অর্জ্জন কর্চ্ছে, আর অল্পসংখ্যক থিয়েটার হাউসগুলি প্রায়ই হাত-বদল হচ্চে। (যুদ্ধের বাজারে কাঁচা পয়সা আমদানীর দিকটা এ প্রবন্ধে ধরা হয়নি; কারণ প্রবন্ধটী তার আগে লেখা।) থিয়েটারের এই দুর্দ্দশার কারণ অনেকে বলেন, সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা। কিন্তু আমি সে কথা স্বীকার করি না। সিনেমা ও থিয়েটারের মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণকে আনন্দ পরিবেশন করা; এদিক দিয়ে উভয় প্রতিষ্ঠানের পরস্পরের মধ্যে মিল থাকলেও থিয়েটার চলে জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষ নিয়ে, আর সিনেমা চলে মানুষের ছায়া নিয়ে। দুই প্রতিষ্ঠানের আবেদন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। গন্তব্যস্থান এক হলেও পথ দু'জনকার আলাদা। সুতরাং প্রতিযোগিতার প্রশ্ন এখানে উঠতেই পারে না। বর্ত্তমানে অধিকাংশ থিয়েটার যে অল্পায়ু হয়ে পড়ছে, তার কারণ, সেই সব থিয়েটারের জীবনী শক্তির অপ্রাচুর্য্য অর্থাৎ তাদের আভ্যন্তরীণ দৈন্য। বিশেষ ভাবে এই অভাবগুলি বিশ্লেষণ করে দেখাতে যাওয়া অল্প-পরিসর প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। তবে মোটামুটি ভাবে দু'একটী বিষয় উল্লেখ করতে চাই; সেগুলি বিবেচনা করলে কলকাতার থিয়েটারগুলির কর্ত্তৃপক্ষ হয়তো বা লাভ-বান হতে পারেন। থিয়েটারের পিছনে মোটা ক্যাপিটাল থাকা, সরকারী সাহায্য লাভের প্রচেষ্টা প্রভৃতি অনেক বড় বড় বিষয় নিয়ে এর আগে অনেকে অনেক আলোচনা করেছেন। ওসব যাঁরা পান বা পাবার আশা রাখেন, তাঁরা ভাগ্যবান। বড় বড় বিষয় বাদ দিয়ে,

আমি বলব ছোট দু'একটী কথা, যা...ইচ্ছে কর্লেই থিয়েটারগুলো একসঙ্গে মিলে গঠন করে তুলতে পারেন।

প্রথম অভাবের কথা হ'ল: থিয়েটারগুলোর মধ্যে ব্যবসাগত ঐক্য। চিত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমবায় আছে; সেখানে তাদের সাধারণ অভাব-অভিযোগের আলোচনা হয় এবং অভাবগুলির প্রতিকারের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কলকাতার থিয়েটারগুলোর কোনো সঙ্ঘবদ্ধ মিলন কেন্দ্র বা Association নেই। এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে পাবলিসিটির জন্যে থিয়েটারগুলির কম পয়সা খরচ হয় না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বলুন কিম্বা পোষ্টার, ফ্লাইসীট্ ছাপানো বলুন, সবদিক দিয়েই থিয়েটারকে নির্ভর করতে হয় কাগজওয়ালা বা ছাপাখানার নির্দ্ধারিত মূল্যের উপর। থিয়েটারগুলো সঙ্ঘবদ্ধ হ'লে কি এদিক দিয়ে খানিকটা সুবিধে পাওয়া যায় না? পাবলিসিটির বিষয় আমি উল্লেখ করলুম একটা উদাহরণ হিসাবে। এ ছাড়া, থিয়েটারের এমন অনেকগুলি ব্যবসাগত অভাব-অভিযোগ আছে, যেগুলি একটী সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র গঠন কর্লে অনায়াসে দূর হতে পারে।

মঞ্চ-সংশ্লিষ্ট সমস্ত শিল্পীর জন্য Provident Fund বা ঐ ধরণের কোনও "ফণ্ডের" ব্যবস্থা করা সব থিয়েটারের একান্ত কর্ত্তব্য। অপরিমিত ব্যয়ের ফলে শেষ জীবনে অধিকাংশ শিল্পীকে যে কি দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করতে হয়—তা আমরা কতবার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। শিল্পীর অকাল-মৃত্যুতে শোক সভা করেই যেন আমাদের সকল দায়িত্ব শেষ না হয়। মৃতের পিছনে যারা পড়ে রইল—জীবন্ত মৃত্যুর যাতনা সইতে—তাদের আর্থিক ক্লেশ লাঘব

করবার খানিকটা দায়িত্ব রঙ্গমঞ্চকে নিতে হবে বৈকি? রঙ্গমঞ্চ যদি শিল্পীকে সে প্রতিশ্রুতি দেয়—তা'হলে মঞ্চের লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। প্রত্যেক মঞ্চের শিল্পী তা'হলে নিজ নিজ কর্ম্মস্থলকে—নিজের জিনিষ বলে ভাবতে শিখবে। বাইরের প্রলোভন তাকে তার মঞ্চ হ'তে সহসা অন্যত্র টেনে নিতে পারবে না। এবং মঞ্চের সঙ্গে শিল্পীর এই যে একাত্মবোধ—শিল্প-সৃষ্টির পক্ষে এর মূল্য অনেকখানি।

আর একটী বড় অভাব...ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবেও বটে এবং কলা-কেন্দ্র হিসেবেও বটে, সে হ'ল, থিয়েটারের সঙ্গে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষার সংযোগ স্থাপন। নাটক নির্ব্বাচন, নাট্য-পরিচালনা, নাটকের দৃশ্যপট নির্ম্মাণ, অভিনেতার রূপ-সজ্জা, নাটকের চরিত্র রূপায়ন প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ যদি শ্রেষ্ঠ প্রতিভার উপদেশ ও সাহায্য পান, তার ফলে, থিয়েটার যে কত রকমে লাভ-বান হয় সে কথা বলাই বাহুল্য। এককালে ষ্টারে আর্ট থিয়েটারের আমলে এবং শিশিরকুমারের নাট্য-মন্দিরে এইরূপ প্রতিভা-সমাবেশের কথা শুনেছি। থিয়েটার হয়েছিল তখন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণীর মিলনতীর্থ। তাঁরা সকাল-সন্ধ্যায় থিয়েটারে সমবেত হয়ে শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান কতো বিষয়ে আলোচনা করতেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযোগে থিয়েটারে একসঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন হোতো। এখন দু'জনকার মিলন হওয়া তো দূরে থাক, দুজনেই যে বিদায় নিতে বসেছেন! থিয়েটারে দেশের মনীষা-সম্মিলন কি এমনই কষ্টসাধ্য 'ব্যাপার—যার জন্য আজ থিয়েটারগুলোর এই দুর্দ্দশা হয়েছে?

আর একটি অভাবের কথা উল্লেখ করে এ নিবন্ধ শেষ করতে চাই।

সে হ'ল…থিয়েটারের আভ্যন্তরিক সমিতি—যে সমিতিতে শুধু প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থনের বাহ্যিক আড়ম্বর না রেখে—থিয়েটারের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধানের আলোচনা হবে। প্রত্যেক থিয়েটারে সপ্তাহে অন্ততঃ এক আধ দিন ছুটির ব্যবস্থা আছেই। সেইদিন যদি থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ, অভিনেতৃগণ বা অভিনয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ একসঙ্গে মিলিত হয়ে সাময়িক অভাব অভিযোগের বিষয় আলোচনা করেন, তা হ'লে প্রত্যেকেই লাভবান হতে পারেন। এ ছাড়া সম-সাময়িক সাফল্য-মণ্ডিত নাটক বা চলচ্চিত্রের সাফল্যের কারণ নির্ণয়, নবাগত নট-নটীকে শিক্ষা দান প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাও সেই সমিতিতে হ'তে পারে। বদ্ধ আব-হাওয়ার ভিতর দিনের পর দিন থিয়েটার সংশ্লিষ্ট লোকদের কোন রকমে "দিন-গুজরাণ" ক'রতে হয়; এই রকম একটী পারস্পারিক মিলন-কেন্দ্র স্থাপিত হ'লে—তাঁরা সবাই পৃথিবীর মুক্ত হাওয়ায় খানিকটা নিঃশ্বাস নিতে পারেন, বৃহত্তর পৃথিবীর যেটুকু সূর্য্য-কিরণ তাঁরা লাভ কর্ব্বেন, তাতে তাঁদের পরমায়ূ বৃদ্ধিই হবে।

ব্যবসায়ী-মঞ্চ

ব্যবসায়ের দিক থেকে থিয়েটার সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলব।

যুদ্ধের বাজারে অনেকে প্রচুর কাঁচা পয়সা রোজগার কচ্ছেন। পয়সা তাঁদের কাছে আসছে যেমন জলের মত...খরচ হ'তে চাইছেও তেমনি জলের মত। তাঁদের ভেতরে অনেকে ঝুঁকেছেন থিয়েটার খুলতে। কলকাতা শহরের সব বড় বড় রাস্তায় থিয়েটারের জন্য বাড়ী খোঁজবার ধুম পড়ে গেছে।

সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই কলকাতা শহর বাদে আর কোথাও প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে নিয়মিত অভিনয় ব্যবস্থা নেই। এই শিল্পকে, এই ব্যবসায়কে বাঁচিয়ে রেখেছে বাঙ্গালী। শিল্পচর্চ্চা হিসাবে এবং জীবনের বৃত্তিরূপে শুধু বাঙ্গালীর কাছেই অভিনয়কলা অবিভাজ্য রূপ নিয়েছে। তাই গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে এক কলকাতা শহরে পাঁচটি প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে নিয়মিত অভিনয় হচ্ছে। এটা আমাদের গৌরবের কথা।

এই পাঁচটী থিয়েটার ব্যতীত আরও নূতন নূতন থিয়েটার যদি কলকাতায় স্থাপিত হয়, তাতে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। যেখানে অগুন্তি সিনেমা হাউস রঙ্গামোদী দর্শকগণের এক বিরাট অংশ টেনে নিচ্ছে, সেখানে যদি পাঁচটী থিয়েটারের সঙ্গে আর দু'-চারটী নূতন থিয়েটার যোগ দেয়—তা'হলে সমষ্টিগত ভাবে থিয়েটার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী দর্শক আকর্ষণ করবে—থিয়েটারের বল-বৃদ্ধি হবে। তাই বলছিলুম—থিয়েটার সংখ্যায় যত বেড়ে যাবে ততই আমাদের আনন্দের কথা, আশার কথা। থিয়েটারের সংখ্যাবৃদ্ধি হলে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা সব থিয়েটারগুলি দুর্ব্বল হয়ে পড়বে—ব্যবসায়ের ক্ষতি হবে—যাঁরা এই যুক্তি দেখান, তাঁদের আমি সমর্থন করতে পারি না।

তবে এ বিষয়ে ভাববার কথা আছে। নূতন থিয়েটার খুলতে গেলে আগে বর্ত্তমানের পাঁচটী থিয়েটারের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। যাঁদের মস্তিষ্কে নূতন থিয়েটার পরিচালনার কল্পনা জেগেছে—তাঁরা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন যে, শহরের পাঁচটী রঙ্গালয় বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী দর্শক আকর্ষণ কর্চ্ছে, থিয়েটারগুলির অবস্থা অনেকটা সচ্ছল হয়েছে। থিয়েটার-ব্যবসায়ে লাভবান হওয়া যায় এ ধারণা মনে না এলে…তাঁরা নিশ্চয়ই এ ব্যবসায়ে নামবার পরি-কল্পনা করতেন না। কিন্তু আসল ভাববার কথা এই যে—এখন-কার পাঁচটি থিয়েটার পয়সা পাচ্ছে, সুতরাং আমরাও পাবো—এই যুক্তি অনুসরণ করে তাঁরা ব্যবসায়ে নামতে চাইছেন কিনা। তা যদি হয়—তা'হলে তাঁদের আমি এ বিষয়ে একটু অবহিত হতে বলি।

এখন থিয়েটারগুলির বুকিং অফিসে আগের চেয়ে বেশী ভীড় হচ্ছে—একথা আগেই বলেছি। কিন্তু এই আর্থিক সচ্ছলতার মূলে কি? থিয়েটার কি দু'চার বছর আগের চেয়ে এখন সুপরিচালিত হচ্ছে? আগের চেয়ে ভাল নাটক অভিনীত হচ্ছে? অথবা অধিকতর শক্তিশালী নটনটী থিয়েটারে যোগ দিয়েছেন? কেন, কিসের জন্য থিয়েটার হঠাৎ "রম্‌রমে" হয়ে উঠল? আমার মনে হয়, থিয়েটারের বর্ত্তমান আর্থিক সচ্ছলতার জন্য থিয়েটার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজস্ব প্রচেষ্টার চেয়ে…অনেক বেশী দায়ী…বর্ত্তমান পরিস্থিতি। এক টাকার মাল আজ দশ টাকা হয়েছে; অর্থাৎ আগের এক টাকা এখনকার দশ টাকার সমান। কাজেই অস্বাভাবিক ভীড় দেখে থিয়েটারওয়ালারা হঠাৎ বড় মানুষ হয়ে গেল, এ ধারণা করা অন্যায় হবে। এর পর যখন দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে, তখন এই জোয়ারের শেষে

ভাঁটার টানে সব থিয়েটারগুলি হবে টাল-মাটাল! অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে—অত্যন্ত সতর্কভাবে, তখন থিয়েটারকে বাঁচবার জন্য লড়াই করতে হবে। কলকাতার পাঁচটি থিয়েটারের ভিতর ক'টী থিয়েটারের অস্তিত্ব যে বজায় থাকবে তখন—সে আজ বলা শক্ত।

এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সময় যাঁদের অর্থ আছে···তাঁরা নূতন থিয়েটার না খুলে, যদি বর্ত্তমান থিয়েটারগুলির সঙ্গে যোগ দিয়ে, ভাবীকালের বিপদের হাত থেকে তাদের বাঁচতে সাহায্য করেন, সেই হবে সব দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত। থিয়েটারের দুর্দ্দিন আসছে। তার কারণ আগেই বলেছি; বর্ত্তমান স্বাচ্ছল্য থিয়েটার-কর্তৃপক্ষের নিপুণ ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বারা ঘটেনি...এ অস্বাভাবিক স্বাচ্ছল্যের মূলে রয়েছে দেশের বর্ত্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতি।

তবে, হ্যাঁ, আর একটী কথা। যাঁরা থিয়েটারের দায়িত্ব বহন কর্চ্ছেন—তাঁরা সকলেই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে নিশ্চেষ্ট বসে আছেন—ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন না—এ বললে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, থিয়েটার তার যাত্রা-পথের গতি পরিবর্ত্তন করেছে; অন্ততঃ পরিবর্ত্তনের একটা প্রয়াস জেগেছে। ক'বছর আগের কথা ভাবুন—কোনো থিয়েটার হয়তো "অভিজাত সম্প্রদায়" বলে নিজেদের জাহির করতেন—কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখতে পেতেন—বিলাতী সস্তা নাটকের ব্যর্থ অনুকরণ; মেম-সাহেবকে সাড়ী পরিয়ে বাঙালী মেয়ে বলে চালাবার হাস্যকর প্রচেষ্টা! আবার কোনো কোনো থিয়েটার নিজেদের বলতেন—"আদর্শ সনাতন-পন্থী"—সেখানে গিয়ে দেখতে পেতেন—চমকপ্রদ দৃশ্যপটের ভেল্কী, আদিরসাত্মক হাস্য-কৌতুকের প্রাচুর্য্য বা স্রেফ্ ভাঁড়ামী! নাট্য-

সাধনার নামে থিয়েটারের পরিচালকদের চিত্তবৃত্তির এই যে অবনতি —এ থেকে বর্ত্তমানের থিয়েটারগুলি অনেক পরিমাণে মুক্ত হয়েছে। কি অভিজাত আসর, কি সনাতনপন্থী আসর—সকলেই আজ বুঝতে পেরেছেন—সত্যিকারের অভিজাত কিম্বা সনাতন-পন্থী হতে হলে—নিজ নিজ চিত্ত-বৃত্তির শুদ্ধি প্রয়োজন। দর্শকের চিত্তবৃত্তিকে আমরা নিম্ন-গামী বলে ভাবতুম; তার কারণ আমাদের চিত্তবৃত্তিই ছিল নিম্নগামী। দর্শক-সমাজ অনন্ত সমুদ্রের মত; চোখে যে রঙের কাঁচ লাগিয়ে আমরা তাদের দেখব, মনে হবে সেই তাদের স্বাভাবিক রঙ।

বর্ত্তমান থিয়েটারের পক্ষে আশার কথা এই—যে, তারা প্রত্যেকে এ বিষয়ে সচেতন হয়েছে। সব ক'টী রঙ্গালয়েই দেখুন—আজ এমন নাটক অভিনীত হচ্ছে, যা পরগাছাও নয়—আগাছাও নয়; দেশের মাটী থেকে তারা রস সংগ্রহ করেছে; জাতির জীবনের ঠিক কেন্দ্র-স্থলেই তাদের মূল ভিৎ গেড়েছে। থিয়েটারের দোষ-ত্রুটি এখনো যথেষ্ট আছে; কিন্তু তাদের মূলের গলদ যে তারা বুঝতে পেরেছে—দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে সামনে এগুতে চেষ্টা কর্চ্ছে—এইটিই হল সব চেয়ে আশার কথা। বর্ত্তমানের এই প্রচেষ্টা যদি কোন থিয়েটার পরিম্লান হতে না দেয়—আভ্যন্তরিক গোলযোগ অথবা বুদ্ধি বিপর্য্যয় দ্বারা এই প্রচেষ্টায় যদি শৈথিল্য না আসে...তা হলে ভাবী-কালের দুর্ব্বিপাক থেকে থিয়েটারগুলি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে...এরূপ আশা করা একটুও অসঙ্গত হবে না। অর্থবান যাঁরা, নাট্য-রসে-রসিক সজ্জন যাঁরা, থিয়েটারের এই গতি পরিবর্ত্তনের সময়...তাঁরা অর্থ নিয়ে, অভিজ্ঞতা নিয়ে ও সহানুভূতি নিয়ে যদি বর্ত্তমান রঙ্গালয়গুলিকে সাহায্য করেন, তা'হলে বাংলার রঙ্গালয় তার গতিপথে যে অনেক খানি অগ্রসর হতে পারবে...একথা সুনিশ্চিত।



বিশ্ব-বিশ্রুত নর্ত্তক উদয়শঙ্কর



নৃত্যছন্দা সাধনা বোস

অভিনেত্রী

বর্ত্তমানে মঞ্চজগতে অভিনেত্রী সমস্যা একটা বড় সমস্যা। মঞ্চজগতে অভিনেত্রী নেই—মাত্র দু'একটী বাদে। "রিক্রুট" করবার লোকের অভাব—এর একটী বড় কারণ। তথা কথিত অভিজাত সম্প্রদায় থেকে অভিনেত্রী "রিক্রুট" করবার লোকের অভাব নেই—কিন্তু সেই সব অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েরা পাদপ্রদীপের আলোকে দেখা দেবার চাইতে ঢের বেশী পছন্দ করেন ছায়ালোকে বিচরণ করতে। (যাঁরা যত বেশী "রিয়ালিষ্টিক" তাঁরা তত বেশী পক্ষপাতী "মিস্‌টি-সিজিমের"—এ থেকে এই কি প্রমাণ হয় না?)···পূর্ব্বোক্ত সমাজ বাদ দিলে অভিনেত্রী নির্ব্বাচনের আর যে সব ক্ষেত্র রইল—তার মাঝখান থেকে সত্যিকারের প্রতিভার সন্ধান পাওয়া বড়ই দুরূহ। তা ছাড়া সুন্দরী, সুকণ্ঠি ও প্রতিভাময়ী তরুণী রঙ্গমঞ্চ থেকে যে পারিশ্রমিক পাবেন—জীবন-যাত্রার পথে সমাজ-বন্ধনের বাধা নিষেধ যদি তিনি না মানেন—তা হ'লে রঙ্গমঞ্চের নিকট থেকে প্রাপ্ত পারিশ্রমিকের তুলনায় অনেক বেশী টাকা রোজগার করতে পারবেন অন্য পথে। তাই মঞ্চলোকে অভিনেত্রীর এত অভাব।

পরবর্ত্তী শ্রেণী (যাঁদের ভেতর থেকে বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের সাড়ে পনের আনা অভিনেত্রী নির্ব্বাচিত হন)—তাঁদের বিষয়ে প্রথমে দু' একটী কথা বলতে চাই। বাইরের জগতের ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন এড়িয়ে যদি তাঁরা বেশ কিছুদিন রঙ্গমঞ্চে টিকে থাকবার ধৈর্য্য অবলম্বন করতে পারেন—তা হলে অভিনেত্রী-জীবন বেছে নিয়েছিলেন বলে পরে তাঁরা আত্ম-তৃপ্তিই লাভ করবেন। আসল কথা হ'ল, অভিনয়ের স্পৃহা জাগিয়ে তোলা। যাঁর মধ্যে প্রতিভা আছে, এ স্পৃহা তাঁর মনে জাগবেই—কারুর দু'দিন আগে, কারুর বা দু'দিন পরে। অভিনয়ের আকাঙ্খা···নিত্য নূতন চরিত্র রূপায়নের স্পৃহা—এ এমনি

দুর্দ্দমনীয় যে, এই রস উপলব্ধির পর বাইরের হাজার রকম প্রলোভন এলেও অভিনয়-মঞ্চ হতে কোনো নট বা নটীকে কেউ সরিয়ে নিতে পারে না। রঙ্গমঞ্চ তার শিল্পীকে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যা কিছু ধরে দেয়—সেই পারিশ্রমিক হয়ে দাঁড়ায় শিল্পীর কাছে সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রধান বস্তু—অভিনয় করা, দর্শককে রস পরিবেশন করা—সেই হয় তখন তা'র জীবনের চরম লক্ষ্য।

সমাজ-বন্ধন-হীন জীবন যাঁদের—সেই শ্রেণী থেকেই অভিনেত্রী নির্ব্বাচন করেছিলেন নটগুরু গিরিশচন্দ্র। বাইরের সহস্র ঘূর্ণাবর্ত্ত... পঙ্কিল পথের অসংখ্য বিচ্যুতি থেকে তাঁদের বাঁচিয়ে তোলবার প্রচেষ্টা ছিল তাঁর অন্তরে। রঙ্গমঞ্চের আড়ালে ছিল সর্ব্বতোভাবে সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা। আজ মঞ্চজগৎ প্রধানতঃ ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই গিরিশ-যুগের সে সাধনা আর নেই—এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। মঞ্চজগতের এ পরম অধোগতি—তার জন্য তাকে ফলভোগও করতে হচ্ছে। রঙ্গমঞ্চ আবার তার বিস্মৃত সাধনায় ব্রতী হোক্...এ কামনা অন্তরে পোষণ করি। তবে রঙ্গমঞ্চের তরফ থেকে অন্য পক্ষকে এই কথাটি বলতে চাই যে, রঙ্গমঞ্চ যদি পূর্ব্বের মত প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁদের শিক্ষা দীক্ষায় ব্রতী নাও হয়, তবু, হাঁ...তবু রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে এসে পরোক্ষভাবে তাঁরা যে বিত্ত লাভ করবেন...তা বন্ধনহীন জীবনের পথে অনেক বড় অবলম্বন হয়ে রইবে।

•

আর, অভিজাত সম্প্রদায়ের অভিনেত্রী! রঙ্গমঞ্চের ভেতরকার আব-হাওয়ায় তাঁদের শুচিতা রক্ষা করে চলা যতখানি কঠিন বলে তাঁরা মনে করেন...এইটুকু ভরসা তাঁদের দিতে পারি...এখানকার হাওয়া

ঠিক ততখানি দূষিত নয়। (মাফ কোরবেন....এমন অনেক সান্ধ্য-সম্মিলন বা ওরিয়েণ্টাল ডান্সের ক্লাবে—যোগ দিতে তাঁদের অনেকের অপরিসীম ঔৎসুক্য দেখা যায়...যার তুলনায় পাবলিক থিয়েটারকে মন্দির, গীর্জ্জার সামিল বলা চলে।) নিজের মর্য্যাদা বাঁচিয়ে চলবার ক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁকে লড়তে হয় অনেক ক্ষেত্রে সেই মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য; কিন্তু রঙ্গমঞ্চে এলে তার জন্যে লড়তেও হয় না... রঙ্গমঞ্চের নট-নটী আত্মমর্য্যাদা সচেতন নারীকে প্রণাম করে দূরে সরে দাঁড়ায়—সেরূপ নারীকে সম্ভ্রম দেবার শিক্ষা মঞ্চের শিল্পীদের আছে। হ্যাঁ, এ কথার মানে...কিন্তু এই নয় যে, আমি অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েদের প্রলুব্ধ করে আনতে চাইছি রঙ্গমঞ্চের দিকে। সত্যিকারের অভিনয়-প্রতিভা দেখাবার ক্ষেত্র রঙ্গমঞ্চ কিম্বা চিত্রলোক, সে বিষয়ে আলোচনা করবার অবকাশ বা সুযোগ এ প্রবন্ধে নেই। মোটামুটি ভাবে বলতে পারি—রঙ্গমঞ্চের দাবী এ বিষয়ে ছায়ালোকের চেয়ে কম নয়। সুতরাং আমি রঙ্গমঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি—অভিজাত সমাজের সেই সব তরুণীদের, যাঁদের প্রতিভা আছে, দেহসৌষ্ঠব আছে, অভিনয়ের স্পৃহা আছে—আর সব চেয়ে বড় কথা—সেই সঙ্গে আছে, প্রখর আত্মমর্য্যাদা বোধ।

বর্ত্তমানের অভিনেতা

গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু-অমৃতলাল-দানীবাবুর যুগ চলে গেছে। তারপর অভিনেতৃ জীবনে নবযুগ এনেছিলেন নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার। শিশিরকুমারের সমসাময়িক যুগের অভিনেতা অহীন্দ্র-নির্ম্মলেন্দু-রাধিকানন্দ-নরেশ-তিনকড়ি-দুর্গাদাস-মনোরঞ্জন-বিশ্বনাথ-যোগেশ-রবি-ভূমেন-জীবন-শৈলেন-শরৎ-প্রভাত-সন্তোষ-জহর-জয়নারায়ণ প্রভৃতি। এঁদের কেউ বা সংসার রঙ্গমঞ্চ হ'তে অবসর নিয়েছেন; কেউ বা নাটমঞ্চের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবসর যাপন করছেন—কেউ বা মঞ্চ-লোকের সঙ্গে বিজড়িত থেকে শুধু পূর্ব্ব-গৌরবের অস্তাচল পানে স্মৃতি-ভারাতুর হৃদয়ে তাকিয়ে আছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা মঞ্চলোকের সঙ্গে আজও সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, হয়তো তাঁরা অনেকেই আমার এ উক্তিতে প্রীত হবেন না। কিন্তু তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, তাঁরা আমায় ভুল বুঝবেন না; তাঁদের সকলেরই যে অভিনয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে সে কথা আমি বলি না। আমি বলছি, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বয়সের জন্য, কেউ বা উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার যোগাযোগ না ঘটবার দরুণ…যে কোন কারণেই হোক্ না কেন,—দু'চার বছরের মধ্যে এমন কোন চরিত্র রূপায়িত করতে পারেন নি…যা নাকি তাঁর অভিনেতৃ জীবনের পূর্ব্ব-গৌরবকে ম্লান করে দিতে সক্ষম হয়েছে।

পূর্ব্ববর্ণিত অভিনেতাদের বিষয়ে আমার কোন নালিশ নেই। তাঁদের অনেকেই শক্তিমান, রঙ্গজগতের অভিনয় ধারা তাঁরা অনেকখানি পরিবর্ত্তিত করেছিলেন; উপযুক্ত সুযোগ পেলে হয় তো তাঁদের অনেকে এখনো শক্তির বিকাশ দেখাতে পারবেন। আমার এ আলোচনা তাঁদের জন্য নয়,—এ আলোচনা পরবর্ত্তী যুগের অভিনেতাদের সম্বন্ধে।

কিন্তু কৈ? কোথায় অভিনেতা? (ছবিবাবু প্রভৃতি আমায় মাফ করবেন, Every Law has its exception. একটী বা দুটী অভিনেতার আবির্ভাবকে accident-এর পর্যায়ে ফেললে বোধ হয় দোষ হবে না। আমার অভিযোগ ব্যক্তিগত নয়—সমষ্টিগত ভাবে মঞ্চের আধুনিকতম অভিনেতৃ গোষ্ঠি সম্বন্ধে।) আধুনিকতম অভিনেতা-দের বিষয়ে যদি কেউ বলে যে তাঁদের অনেকেই ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মনো-ভাব নিয়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, রাজকিষণ ষ্ট্রীট বা বিডন ষ্ট্রীটে আশ্রয় নিয়েছেন···তা হলে কি খুব অন্যায় বলা হবে? সেই দশটা পাঁচটার মনোভাব, সেই মাসকাবারের টাকার হিসাব, কোম্পানীর সেই মামুলি অবিচারের বিষয়ে জটলা, অন্য কোম্পানীর বোনাস্ ও বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে উদারতার কল্প-কথা—এইতো আধুনিকতম শিল্পীর গবেষণার বস্তু। নাট্যশিল্পীর মনের মধ্যে বসে যদি কেরানী-শিল্পী কেবল লেজার (Ledger) বইএর পাতা ওল্টায়—তা হলে রঙ্গমঞ্চের আর্ক ল্যাম্প, স্পট লাইট, ফুট লাইট···সমস্তগুলি আলো একসঙ্গে জ্বেলে দিলেও—কারও সাধ্য নেই সে মঞ্চকে আলোকিত করে।

অমল, ভূপেন, সিধু, মিহির, পঞ্চানন, জীবেন···এঁরা ঠিক এই যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে এসেছেন, এঁরা তবু খানিকটা শক্ত বনিয়াদের ওপর দাঁড়াতে পেরেছেন। ভয় হয় শুধু তাঁদের কথা ভেবে, (যদিও তাঁরা সংখ্যায় এক আধ জনের বেশী নন্) যাঁরা শিল্পী-মন নিয়ে এই অন্ধকারের মধ্যে দৈবাৎ এসে পড়েছেন। এই আকাশ জোড়া অজ্ঞানতার অন্ধকারে, কে জানে,—তাঁরাও কখন শিল্পী-মনের জ্যোতিটুকু হারিয়ে ফেলবেন।

অভিনেতা কে? কি তার স্বরূপ? সে স্রষ্টা, সে

আপনাকে সে স্থষ্টি করে বহু বার, বহু রূপে, বহু ভাবে। রূপের ধ্যান না করলে রূপ-স্থষ্টি হয় না। তাই অভিনেতার প্রয়োজন··· নিষ্ঠা, একাগ্রতা, সাধনা এবং সব চেয়ে বেশী করে প্রয়োজন, নিজের শিল্পকলাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা। শুধু কি তাই ?— নাট্যশালা তার সাধনার মন্দির ; এ মন্দিরের প্রতিটী ইঁট, পাথরকে পর্য্যন্ত নিজের বলে ভালবাসতে হবে। নাট্যমন্দিরের সঙ্গে অভিনেতার এই অচ্ছেদ্য একাত্মবোধই তার রূপ-সাধনাকে সিদ্ধির পথে অগ্রসর করে দেবে। কিন্তু আজ সে নিষ্ঠার অভাব, রঙ্গমঞ্চকে শিল্পীর সাধনা মন্দির-জ্ঞানে ভালবাসার অভাব। নাটমঞ্চে প্রদীপ জ্বলবে কেমন করে ?

কোনো নাটকে পার্ট পেলে বাড়ীতে সে পার্ট উল্টে দেখবার আগে খবরের কাগজ উল্টে দেখবেন, থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে নাম বেরিয়েছে কি না ? নাম কার আগে পড়ল ? কার নামের নীচে পড়ল ? নামের হরফ কত বড় ? স্মল পাইকা, পাইকা, না গ্রেট্ টাইপে··· ? গৃহীত ভূমিকার রূপ সম্বন্ধে নিজে কখনও চিন্তা করা দূরে থাক্— রিহার্সেলে বসে লাষ্ট্-ট্রাম চলে গেল কি না—সেই চিন্তা, আর সেই ধ্যান। রূপসজ্জা করতে বসে—সজ্জার চেয়ে বেশী দৃষ্টি·· সজ্জার উপকরণের ওপর। কোম্পানী কাকে বেশী পাউডার দিল,···ব্রাশ, লিপষ্টিক, তোয়ালে, বসবার চেয়ার, সাজবার আয়না···এগুলো কার তুলনায় নিকৃষ্ট হয়ে গেল—এই তো রূপসজ্জার প্রধানতম লক্ষ্য করবার বিষয় !···সৈনিক সেজে মঞ্চে দাঁড়াতে জানেন না বলে, যে ব্যক্তি দর্শকের কাছে তাড়া খেয়ে এলেন,—ভেতরে এসে তিনিই বলবেন, "পার্টে কিছু নেই ; আমাকে এ পার্টে নামানো হয়েছে শুধু লোক হাসাবার জন্য।" অশিক্ষাকে ক্ষমা করে চলে···কিন্তু অশিক্ষার

দম্ভকে নয়। এই দম্ভ, এই vanity, এই মূঢ়তা,—সব চেয়ে মর্ম্মান্তিক। মঞ্চশিল্প যদি সমবেত সৃষ্টি না হ'ত—এই রূপ-লোকে যদি একক সৃষ্টির অবকাশ থাকতো···তা হলে এতখানি ভয়ের কারণ ঘটত না। অনধিকারীর মঞ্চলোকে এই স্পর্দ্ধিত পাদক্ষেপ—সমস্ত শিল্পপূজারীর প্রচেষ্টাকে অশুচি করে দিচ্ছে। তাই বলছিলুম, মঞ্চের প্রদীপ নিভে যাচ্ছে।

চরিত্র রূপায়ণ করবার জন্য যে ধ্যান ধারণার প্রয়োজন···তা এঁদের নেই। চরিত্রের প্রতি কথা, প্রতি কার্য্য কেন এ রকম হচ্ছে, কেন অন্য রকম হচ্ছে না—সে বিষয়ে এঁদের অধিকাংশই ভেবে দেখবার প্রয়োজন বোধ করেন না। গৃহীত চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা নেই; চরিত্রকে জামার মত গায়ে চাপিয়ে দিলেই হ'ল! চরিত্রের বহিরাবরণটুকু ধরবার চেষ্টা—তাও কি এঁদের নিখুঁত হয়? চাঁদনীর কেনা জামার মত কোনটার হাত লম্বা, কোনটার ঝুল কোমর পর্য্যন্ত উঠেছে···কোনটা বা হাঁটু অবধি নেমে এসেছে। পরমানন্দে এই অপরূপ রূপ নিয়ে তাঁরা মঞ্চের ওপর চলাফেরা কর্চ্ছেন, বিজ্ঞাপনে নামের হরফ ছোট হ'লে কোম্পানীকে পদত্যাগের নোটীশ দিচ্ছেন।

অনেক সময় আধুনিকতম অভিনেতাদের সঙ্ঘশক্তি বা "টিম ওয়ার্কের" দোহাই দিতে শোনা যায়। মঞ্চে "টিম ওয়ার্কের" মানে কি?··· সমবেতভাবে রূপসৃষ্টির প্রয়াস; সবাই মিলে ছন্দ, গতি সকল দিক দিয়ে অসামঞ্জস্য আনবার প্রয়াস নয়। আগের যুগেই বলুন, বা আজকের যুগেই বলুন, "টিম ওয়ার্ক" ব্যতীত কোন নাটকই যথাযথ ভাবে অভিনীত হতে পারেনি। নাট্যকার যে চরিত্রকে

যতটুকু প্রাধান্য দিয়েছেন, সেই চরিত্রের রূপায়ণে অভিনেতার ঠিক তদুপযুক্ত প্রাধান্য আরোপ করবার নামই অভিনয়ের টিম ওয়ার্ক। নাট্যকার যাকে নায়করূপে অঙ্কিত করেছেন—অন্য চরিত্রকে তার অনুবর্ত্তী হয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতে হবে। প্রহরী পিছনের মঞ্চ ছেড়ে রাজার সঙ্গে কথায়, চালচলনে—সমান তালে এগিয়ে আসবার নাম—নাটকীয় ক্রিয়ার সাম্য রক্ষা নয়। এই সহজ সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পারলে "টিম ওয়ার্কের" দোহাই দিয়ে নিজেদের দৌর্ব্বল্য ঢাকবার হাস্যকর প্রচেষ্টা হতে আধুনিকতম অভিনেতা হয়তো বিরত থাকতেন।

শিশিরকুমারের অপরূপ চরিত্র বিশ্লেষণ অথবা চরিত্র সৃষ্টি,...নট-সূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরীর অতুলনীয় রূপ-সজ্জা এবং সর্ব্বশ্রেণীর দর্শককে মঞ্চমায়া বা illusionএ অভিভূত করবার অপূর্ব্ব দক্ষতা,—বাণী-বিনোদ নির্ম্মলেন্দুর শিশুর সারল্যের সঙ্গে অপরাজেয় বাদশাহী dignity এবং ধীরোদাত্ত কণ্ঠের অননুকরণীয় বাচন ভঙ্গী!···তার সঙ্গে আধুনিক অভিনেতাদের শক্তির তুলনা করতে চাই না। ফিরীঙ্গী চরিত্রের রূপদানে ভূমেন রায়ের অসাধারণ নৈপুণ্য এবং আধুনিক যুগের শিল্পী ছবি বিশ্বাসের বাচন ভঙ্গী ও ভাবাভিব্যক্তির অপূর্ব্ব সংযম! এঁদের অভিনয় শক্তির সঙ্গেও আধুনিক যুগের অভিনেতার শক্তির তুলনা করব না। তুলনা মূলক বিচার ছেড়ে দিলেও, প্রত্যেক অভিনেতা অভিনয় কলা সম্বন্ধে সাধারণ-জ্ঞান আয়ত্ব করবেন—এবং নিজেদের শিল্পী বলে ভাবতে শিখবেন···অন্ততঃ এটুকুও কি আশা করা চলে না?

অভিনয়ের সাধারণ জ্ঞানের সব চেয়ে সাধারণ কথা···বাচন ভঙ্গীর

স্পষ্টতা এবং ভাব-বাহকতা। কবিতা আবৃত্তি তো অভিনেতা-সমাজ হতে লুপ্ত হতে বসেছে। অথচ প্রতিদিন যদি মাত্র এক পৃষ্ঠা করেও রবীন্দ্র-কাব্যের আবৃত্তি অভ্যাস করা যায়—তাতে অভিনেতার বাণী শুদ্ধি তো হবেই এবং সেই সঙ্গে কবিগুরুর ভাব-তরঙ্গিত অপূর্ব্ব শব্দ-ঝঙ্কার অভিনেতাকে শব্দ-বৈচিত্র্য দ্বারা ভাব ব্যঞ্জনায় যথেষ্ঠ সাহায্য করবে। এই সহজ কথাটী যদি আধুনিক অভিনেতা মেনে চলেন, তা'হলে আর কিছু না হোক, দর্শকেরা অভিনয় দেখতে এসে অন্ততঃ কর্ণ-পীড়া বোধ করবেন না।

মঞ্চে আজ শিল্পীর অভাব; তার চেয়েও বেশী অভাব শিল্পী মনের। বাইরের জগৎ থেকে অভিনয় কলা সম্পূর্ণ আয়ত্ব করে, সুদক্ষ অভিনেতার দল মঞ্চে অবতরণ করুন—এমন অদ্ভুত প্রত্যাশা রঙ্গ-মঞ্চের নেই। রঙ্গমঞ্চ চায় তেমন শিক্ষিত তরুণদের...যাঁদের দেহ মঞ্চের উপযোগী, সুগঠিত; যাঁরা স্পষ্ট করে কথা বলতে পারেন এবং অভিনয় কলাকে যাঁরা ভালবাসেন। পূর্ণাঙ্গ চরিত্রাভিনেতা, অথবা "টাইপ চরিত্রে" রূপদান-দক্ষ শিল্পী প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চেই হয়তো এখনো দু'একজন আছেন; কিন্তু সুদর্শন, তরুণ, নায়ক চরিত্রের রূপদান করবার উপযুক্ত শিল্পীর আজ যে কতখানি অভাব···তা প্রতিটি রঙ্গমঞ্চ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি কর্চ্ছে। হয়তো দৈবাৎ একটী চেহারা পাওয়া গেল, কিন্তু কণ্ঠ পাওয়া গেল না; হয়তো কণ্ঠ মিলল, চেহারা মিলল না; কদাচিৎ হয়তো দৈবক্রমে কান্তি ও কণ্ঠ দুইই মিলল; কিন্তু তার ভেতর শিল্পীর অন্তরটী খুঁজে পাওয়া গেল না। কান্তি, কণ্ঠ ও শিল্পী-মন এ যাঁর আছে—রঙ্গমঞ্চ তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় সাদরে, পরম আগ্রহের সঙ্গে। হয়তো এমনও হতে পারে—রঙ্গ-মঞ্চের কেন্দ্রস্থলের একটী আসন শুধু তাঁর জন্যই শূন্য পড়ে রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও রঙ্গমঞ্চ

নাট্যকলার উন্নতির জন্য এবং রঙ্গমঞ্চকে নূতন ভাবে গড়ে তোলবার জন্য যে পরিমাণ শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন—আমাদের দেশে আজ তার একান্ত অভাব। এ বিষয়ে যাঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রয়োজন—নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের নাট্য-মন্দির লুপ্ত হবার পর—তাঁরা আর রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে আসেন নি। নাট্য রচনা, প্রয়োগ-পদ্ধতি, অভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্যকলা—প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা প্রকৃত অনুশীলন করেছেন বা এখনো কর্চ্ছেন—তাঁরা যদি সেই বিদ্যা রঙ্গমঞ্চকে সুসংস্কৃত করবার জন্য প্রয়োগ না করেন—তা হলে তাঁদের অধিগত বিদ্যায় নাট্য-ভারতীর কতটুকু সেবা হবে ?

এই সব সুধী, নাট্যামোদীগণ রঙ্গমঞ্চে কৃষ্টির অভাব দেখে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করলে—শিল্প-সাধনা নেই বলে একে "বয়কট" করে চললে—নাট্যশালা নব-চেতনা লাভ করবে কোথা হতে ? রঙ্গমঞ্চের বাইরে দাঁড়িয়ে রঙ্গমঞ্চের উন্নতি করা যায় না ; মাসিক পত্রিকায় অথবা রবিবাসরীয় দৈনিকে প্রবন্ধ রচনা করেও নয়। যত বড় চিকিৎসকই হোন্ না কেন—রোগীর কাছে এসে রোগীকে নিয়মিত পরীক্ষা না করে, কেউ তাকে রোগমুক্ত করতে পারেন না। মঞ্চের কোথায় কি গলদ ঘটল...দিনের পর দিন শিল্পীর গতি-পথে কত নূতন বাধা বিপত্তি পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠল—রঙ্গমঞ্চে এসে সেগুলি প্রত্যক্ষ না করলে—মঞ্চের সংস্কার কার্য্য কি প্রকারে সম্ভব হবে ?

যাঁরা এককালে অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে রঙ্গমঞ্চের শিল্পীদের উপদেশ ও পরামর্শ দিতে এসেছিলেন...শুনতে পাই, তাঁদের অনেকে নানা কারণে মর্ম্মাহত হয়ে, অনেকে বা হতাশ এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে, এর সংস্পর্শ ত্যাগ করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে

নাট্য-কলার অনুরাগী...অথচ একটি কথা বুঝে উঠতে পারি না—যার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক, অন্তরের সম্পর্ক—তাকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা যায় কি করে? রঙ্গমঞ্চের আবহাওয়া যদি তাঁরা সত্যই দূষিত মনে করে এর মধ্যে আর না আসতে চান—তা হলেও নাট্য-কলার প্রতি তাঁরা তো অনুরাগ বর্জ্জিত হতে পারেন না। নাট্যকলা বিষয়ক দু'একটি সাময়িক প্রবন্ধ লিখে সে অনুরাগ যথোচিত প্রদর্শিত হ'ল এবং তাঁদের দায়িত্ব শেষ হ'ল...এই কি বিশ্বাস করতে বলেন?

বিভিন্ন দিক থেকে নাট্যকলার উৎকর্ষের জন্য Aristotleএর যুগ থেকে আরম্ভ করে আজও পর্য্যন্ত য়ুরোপে কত না আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। একমাত্র নাটক রচনা পদ্ধতি বিষয়ক আলোচনার কথা ভাবুন; আদিযুগে Aristotle, Horace, Donatus, Dante; ইতালীয় Renaissance যুগে Danielio, Minturno, Castelvetro, Scaliger: ফরাসী Renaissance যুগে—Sebillet, De la Taille; স্পেনে—Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina; ইংলণ্ডে—Sidney, Jonson, Dryden, Rymer, Farquhar, Addison, Coleridge, Lamb, Hazlitt, Pinero, Jones, Shaw, Archer; সপ্তদশ শতক থেকে ফ্রান্সে—Chapelain, Corneille, Moliere, Racine, Boileau, Voltaire, Diderot, Hugo, Dumas, Sarcey, Zola, Brunetiere, Maeterlinck; জার্ম্মানীতে—Lessing, Schiller, Goethe, Schlegel, Wagner, Freytag.···এ রকম কত মনীষী নাটক রচনা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়েছেন! দুঃখ হয়, লজ্জা হয় এই ভেবে যে—বাংলার নাট্যমঞ্চগুলিতে প্রতি বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২০।২২ খানা নাটকের প্রয়োজন হয়, অথচ বাংলাভাষায় নাটক রচনাকৌশল সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কেউ একখানা

পুস্তক রচনা করবারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। শুধু নাটক সম্বন্ধে নয়,—অভিনেতা, আলোকশিল্পী, দৃশ্যশিল্পী—এঁদের নিয়েই বা এই দেড়শ বছরে বাংলায় ক'খানা বই লেখা হয়েছে? যাঁদের এসব বিষয়ে উৎসাহ, অনুরাগ আছে, তাঁরা কি মঞ্চের এই সকল বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে যথেষ্ট কার্য্যকরী আলোচনা করতে পারতেন না?—বাংলা রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে না আসুন—মঞ্চবিষয়ক যে সব ইংরাজী বই রয়েছে, অন্ততঃ তার গোটাকতক বইএর অনুবাদ করলেও বুঝতাম, তাঁরা দূরে থেকে নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধি কামনা কর্চ্ছেন!

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গমঞ্চের আওতায় কখনো আসেন নি। কিন্তু দূরে থেকেও তিনি বাংলার রঙ্গমঞ্চকে যে বস্তু দিয়ে গেছেন তার তুলনা হয় না। বিশ্বভারতীর পক্ষ হতে শান্তি-নিকেতনে এবং কলকাতায় ফার্ষ্ট এম্পায়ার প্রভৃতি মঞ্চে কবিগুরুর নেতৃত্বে ও শিক্ষায় বিসর্জ্জন, বাল্মীকি-প্রতিভা, রাজারাণী, নটীর পূজা, তাসের দেশ, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নাটকাভিনয় হয়েছে। মঞ্চ-সজ্জায় ও পোষাক পরিচ্ছদ পরিকল্পনায় অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু...সঙ্গীতে সুরভাণ্ডারী দীনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগুরুর সহযোগিতা করেছেন। কবি নিজেও কখনো কখনো নাটকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে (তাঁর দু'একখানি নাটক অভিনয় ব্যতীত) কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট না হয়ে—তিনি নিজস্ব নাট্য-সম্প্রদায় গঠন করে-ছিলেন। অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র, দীনেন্দ্র, নন্দলাল প্রভৃতি শিল্পীর সহযোগে তিনি যে সব নাটক রূপায়িত করেছিলেন—তাতে বাংলার নাট্যরসিক সমাজ এক নূতন রসের সন্ধান পেয়েছিল। সাহিত্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, বাঙ্গালীর বিভিন্ন শিল্পকলায় রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রভাব যেমন সুস্পষ্ট—নাট্যকলার দিক থেকেও সে প্রভাব তেমনি

সুস্পষ্ট বলা চলে। কি ভাবে? আর সব কথা ছেড়ে দিলুম: বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের যুগ-প্রবর্ত্তক নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার রবীন্দ্র প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন বলেই এতখানি সমুজ্জ্বল। শিশিরকুমারের অভিনীত যে কোনো নাটকের কাব্যভাবাপন্ন সংলাপ আবৃত্তির কথা ভাবুন—সে কি বারম্বার রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়নি? নাট্যকলার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ দর্শক—এই দু'য়ের মাঝখানে দৌত্য করেছেন শিশিরকুমার। তবে তিনি কেবল সাধারণ দূত নন্; তাই রবীন্দ্র-প্রতিভা তাঁর সংস্পর্শে রূপান্তরিত হ'ল—সাধারণের আস্বাদন যোগ্য হল—শিশির-প্রতিভারূপে।

বিরাট কোনো প্রতিভার আবির্ভাব হলেই—তার প্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। বিশ্ববিশ্রুত নর্ত্তক উদয়শঙ্করের অপরূপ নৃত্যছন্দের মাধুর্য্যে সারা পৃথিবী বিমুগ্ধ। উদয়শঙ্কর কখনো বাংলার মঞ্চে তাঁর নৃত্য-লীলার বিকাশ দেখান নি। কিন্তু তবু তাঁর প্রভাব রঙ্গমঞ্চে বিস্তার লাভ করেছে। অজন্তা ইলোরার প্রস্তর গাত্র হতে নিপুণ ভাস্কর রচিত মূর্ত্তিগুলি যেন জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়—শঙ্করের দেহে, শঙ্করের নৃত্যছন্দে।

উদয়শঙ্কর অবলুপ্ত নৃত্যকলার পুণরুজ্জীবন করবার পর, আজ সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় নৃত্য-আন্দোলন বন্যার মত প্লাবন তুলেছে। অবশ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৃত্যের দোহাই দিয়ে ব্যর্থ অঙ্গভঙ্গী ঠাঁই পেলেও—কোন কোনো শিল্পী যে সত্যিকারের ভারতীয় নৃত্যকলার অনুশীলন আরম্ভ করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মঞ্চে তখনই উদয়শঙ্করের প্রভাব বুঝতে পারি, যখন দেখি, সারা মঞ্চ জুড়ে

অজস্র কুরূপা নর্ত্তকীর পরিবর্ত্তে মাত্র একটী সুতনু নর্ত্তকীর আবেদন অনেক বেশী। নিম্নস্তরের সস্তা বিলাতী নাচ ভেঙ্গে যে পাঁচমিশালী নাচ তৈরী করে এককালে দর্শকের বাহবা কুড়োনো যেত—আজকের দিনে সেই "থিয়েটারী" ঢংএর নাচ তৈরী করলে দর্শকেরা যখন অপরিসীম বিরক্তি বোধ করেন—তখনই বুঝতে পারি—মঞ্চের দর্শকের মধ্যে এ নৃত্য-চেতনার মূল উৎস—উদয়শঙ্কর।

মঞ্চে না এসে এই ভাবে যাঁরা মঞ্চের শিল্পীদের যাত্রাপথে আলোক-সম্পাত করেছেন—তাঁদের দেখাদেখি দেশের আর কোন মনীষী কি দূর থেকে নাট্যমঞ্চকে সহায়তা করতে পারেন না? প্রত্যেক শিল্প-কলার উৎকর্ষের জন্য শিক্ষা ও সাধনা প্রয়োজন। নাট্যকলার ক্ষেত্রেও এই কথাই প্রযুজ্য। পথভ্রান্ত বাংলার নাট-মঞ্চকে নির্দ্দেশ দেবার জন্য যে শিক্ষায়তন প্রয়োজন···আমার মনে হয়, তা গড়ে উঠ্‌তে পারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশ্যা প্রভৃতি দেশের নাটমঞ্চের জন্য কোটীপতি ধন-কুবেরগণ মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় কর্চ্ছেন। আমাদের নাটমঞ্চের সে রূপ সাহায্যের আশা করাও আজ বাতুলতা মনে হয়। তাই আমাদের নাট-মঞ্চ নূতন কিছু experiment করতে ভরসা পায় না; বাঁধা-ধরা পথে কখনো এগুচ্ছে, কখনো পিছু হট্‌ছে। নাট-মঞ্চ আজ ব্যবসা ক্ষেত্র, ব্যবসায়ে লোকসান হলে শিল্পীকে কেউ ঘর থেকে এনে খেতে দেবে না। ওদেশে তা দেয় বলেই নাট-মঞ্চে নূতন experiment সম্ভব হয়। শুধু নাটমঞ্চে নয়—নাটমঞ্চের বাইরে Universityতে পর্য্যন্ত মঞ্চ-শিল্পের কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমাদের রঙ্গমঞ্চ ব্যবসাক্ষেত্র হলেও—বিশ্ববিদ্যালয় তা নয়। ইংরাজী,

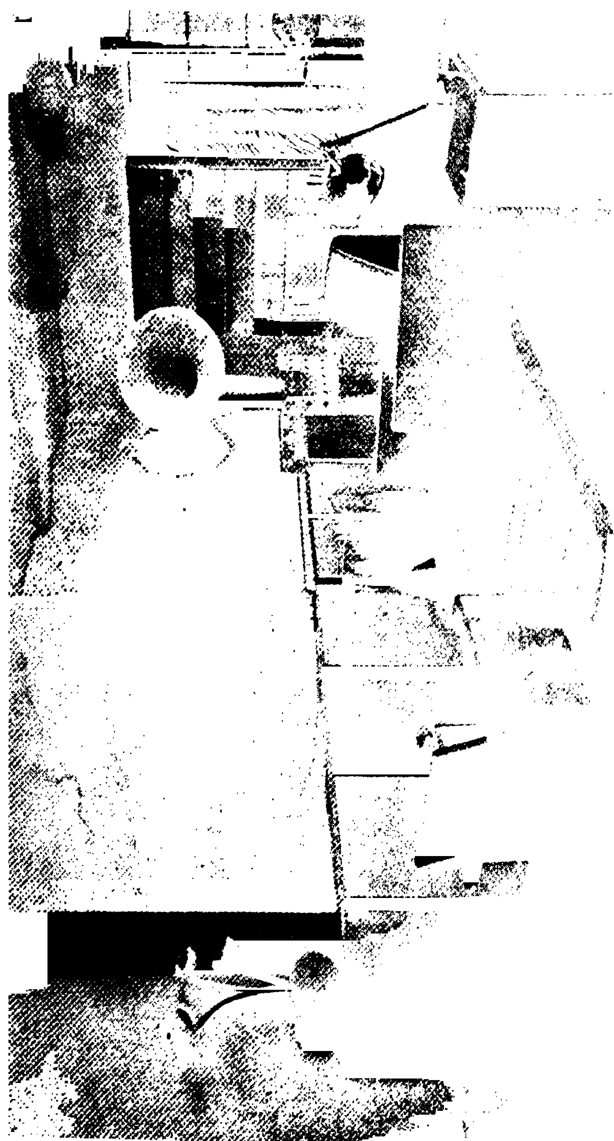
বাংলা—খানকতক নাটক পাঠ্য-তালিকাভূক্ত করে, অথবা গিরিশ লেক্‌চারার (Girish Lecturer) নিযুক্ত করে—মহাকবির জীবনী আলোচনা করিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন নাট্য-কলার উন্নতি কল্পে তাঁদের সমস্ত করণীয় কার্য্য শেষ হয়ে গেল—তা হ'লে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছু নেই। শুধু নাটক ও নাট্যকারের জীবনী না পড়িয়ে—তাঁদের উচিত নাটক-রচনা কৌশল (Technique in Drama) সম্বন্ধে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা। অভিনয়, দৃশ্যরচনা, মঞ্চের আলোক-সম্পাত প্রভৃতি বিষয়ে সুদক্ষ শিল্পী-দের দিয়ে মাসে মাসে আলোচনার ব্যবস্থা করা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে খুবই অসম্ভব ?

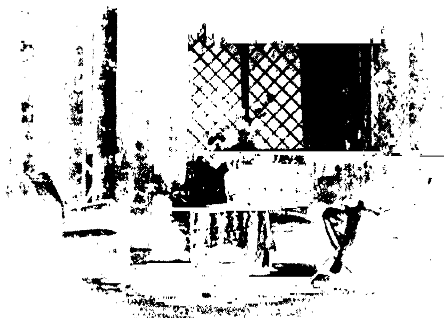
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব মঞ্চ রয়েছে য়ুনিভার্সিটি ইন্‌সটি-টিউট্‌ (University Institute). বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশে যে নাটক রচিত হবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাতেই Instituteএ হবে সেই নাটকের অভিনয়। বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলি সেই শ্রেষ্ঠ মনীষী-গণের বহু অনুশীলন সঞ্জাত নাট্যাভিনয় দেখে—গঠন করবে নাটক—প্রবর্ত্তিত করবে নূতন অভিনয় ধারা। তা না করে University Institute যদি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনীত নাটক খুঁজে বেড়ায়—সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শিল্পীদের অনুকরণে অভিনয় করে—তা হলে বাংলার অন্ধকার রঙ্গমঞ্চের পথের দিশারী হবে কে ?

কলকাতা শহরে অগুন্তি নাচের ইস্কুল আছে, গানের ইস্কুল আছে। বিল্ডিং আর্কিটেক্ট (Building Architect) থেকে আরম্ভ করে ছুঁতোর মিস্ত্রির কাজ পর্য্যন্ত শিক্ষা দেয়—এমন ধরণের টেক্‌নিকাল (Technical) ইস্কুলের অভাব নেই। অথচ নাট্য-শিল্প বিষয়ক

শিক্ষার জন্য মাত্র একটী বিদ্যালয়ও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। হাজার হাজার দর্শকের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রত্যেককে সমভাবে মন্ত্র-মুগ্ধ করে রাখবার কলা-কৌশল কি এতই সহজ-সাধ্য যে তার জন্য কোনও শিক্ষার আবশ্যকতা নেই? রঙ্গালয় শিল্পীকে শিক্ষা দিতে পার্চ্ছে না; তার প্রধান কারণ, মঞ্চে এসেই শিক্ষার্থী রাতারাতি ভোল্ পাল্টে বসেন। তিনি আর শিক্ষার্থী থাকেন না; দাবী করেন পুরোদস্তুর শিল্পীর মর্য্যাদা অর্থ। যশঃ, পদমর্য্যাদা, মঞ্চের সমস্ত লোভনীয় বস্তুগুলি তাঁর চারিপাশে অকস্মাৎ একটী আরব্য-রজনীর সুখস্বপ্ন বিস্তার করে। যে পথে চলতে শেখেন নি…যে রাজ্যের ভাষা পর্য্যন্ত জানেন না—সেখানে নিজেকে কল্পনা করে বসেন সর্ব্বাধিনায়ক রূপে! অধিকাংশ নবাগত শিক্ষার্থী অকস্মাৎ বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়েন বলেই—রঙ্গমঞ্চে শিল্পী তৈরী হচ্ছে না; এবং শিল্পী তৈরী হচ্ছে না বলেই—মঞ্চ আজ বিভ্রান্ত ও দিশেহারা।

চোখের সামনে কেউ ডুবে যাচ্ছে দেখে আমরা হা হুতাশ করব; অথচ শক্তি থাকতে তাকে টেনে তুলবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেব না! ডুবন্তকে অসাবধানতার জন্য তিরস্কার করব; শক্তিহীন বলে উপেক্ষা করব; সে আশ্রয় ভিক্ষা করলে—নিষ্ক্রিয় থেকে বলব—"উপায় নেই—আমরা যে পরাধীন।" বিদ্যার পীঠভূমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বাংলার বিপন্ন রঙ্গালয়গুলি অবশ্য এ ধরণের জবাব প্রত্যাশা করে না; বরং আশা রাখে, বিশ্ববিদ্যালয় নূতন নাট্য-বিদ্যালয় গড়ে তুলে—বাংলার জাতীয় সংস্কৃতিকে সকল দিক দিয়ে পূর্ণতা দান করবেন।





"কঙ্কাবতীর ঘাটের" একটী দৃশ্য। পিছন থেকে আলো ফেলা হয়েছে।



মহেন্দ্র গুপ্ত

স্বাগতম্

পুরাতন শেষ হয়ে এসেছে,—তবু নূতনের পদধ্বনি কৈ? "If winter comes···can spring be far behind?"—এ কবি-বাণীর সার্থকতার আভাস মাত্র যদি আজকের জরাজীর্ণ রঙ্গমঞ্চে দেখতে পেতুম·· তা হলে পুরাতনকে বিদায়-অভিনন্দন জানাতে মনে এতটুকু দ্বিধা জাগত না। পুরাতনের শূন্য আসনে অভিষেক করতুম আমরা সগৌরবে, পরমোৎসাহে সেই নবীন শিল্পীকে। কিন্তু কোথায় সে শিল্পী?

নূতনের আবির্ভাব হয়নি; তাই আজও হৃত-স্বাস্থ্য, বয়ঃ-ম্লান, নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার যে কোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লে—বাংলার নাট্যরস-পিপাসু-হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে তাঁর অফুরন্ত মধুচক্রের রস আস্বাদন করতে। বিশ্রাম-বিহীন কত দীর্ঘ বৎসর অতীত হয়ে গেল; বাংলার রসিক সমাজ তবু "নট-সূর্য্যকে" আজও অস্তাচলে পা বাড়াতে দেবে না; আজও বন্দনা কর্চ্ছে তাঁকে কীর্ত্তির উদয়াচলে বসিয়ে। নিভৃত পূজা-মন্দিরে বসে "বাণী-বিনোদ" আজ মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে দেব-স্তুতি পাঠে ব্যাকুল; বাংলার রস-পিপাসু-চিত্ত, তবু আজও মুক্তি দেবে না তাঁকে নাটমঞ্চ হতে; অমন উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে নাট্য-ভারতীর আরাধনা করবে—তেমন নিষ্ঠাবান পুরোহিত আজও এল না যে।

সত্য বটে, যা কিছু প্রাচীন তার দিকে মানুষের একটা প্রকৃতি গত মোহ থাকে। কিন্তু তা বলে "আমাদের যুগে যেমনটি হ'ত—এ যুগে তেমনটী হয় না"—চোখ বুজে এ কথা যাঁরা বলেন, আমি তাঁদের দলে নই। শিশির-অহীন্দ্র-নির্ম্মলেন্দুর যুগের বন্দনা না গেয়ে, যদি বর্ত্তমানের স্তুতি গান করতে পারতুম, তা হলে মনে মনে অনেক বেশী গৌরব ও আনন্দ বোধ করতুম। কারণ বর্ত্তমানের শিল্পী আমারই সমসাময়িক—আমার দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হয় তাঁদেরই সুখ দুঃখের অংশী হয়ে।

আজকের দিনেও পুরাতনকে প্রশংসা কচ্ছি বলে হয় তো এ যুগের শিল্পী-বন্ধুরা কেউ কেউ ক্ষুণ্ণ হবেন। হয়তো বা বলবেন: পুরাতন বৈচিত্র্য হারিয়েছে, নূতন কিছু সৃষ্টি করতে গেলেও তাঁদের নব-সৃষ্টির মাঝখানে পূর্ব্বাভিনীত চরিত্রের ছায়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ব্ব-যুগ সম্বন্ধে হয়তো কারো কারো এই রকম অভিযোগ উপস্থিত হবে। কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে—যদি তাঁদের এ অভিযোগ সত্য বলে মেনে নিই—তাতেই বা দোষ কি?—নূতন কিছুর প্রত্যাশা করব কার কাছে? যাঁরা দীর্ঘকাল নানা উপচারে নাট্য-ভারতীর পূজা করে আজ পুরাতন হয়ে গেছেন—তাঁদের কাছে...না যৌবন-দৃপ্ত নবীনের কাছে? একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই—আধুনিক-তম যুগের কোনো শিল্পী আজ পর্য্যন্ত এমন কোনো চরিত্র রূপায়িত করতে সক্ষম হন নি—যা দেখবার জন্যে পাঁচ বৎসর পর—দর্শকেরা অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে রঙ্গমঞ্চে ছুটে আসবে। এ যুগের কোনো সু-অভিনীত নাটক পাঁচ বৎসর পর আবার অভিনীত হলে হয়তো দর্শক আসবে "টিম ওয়ার্ক" দেখবার জন্য...অথবা নূতন শিল্পী-সজ্ঘ নাটককে কি নব-রূপ দিচ্ছেন—তাই দেখবার জন্য। কোনো বিশেষ অভিনেতা কোন একটী বিশেষ চরিত্র রূপায়ণে এমন অপরূপ দক্ষতা প্রকাশ কর্লেন—যার ফলে চরিত্রটী classicalএর পর্য্যায়ে স্থান পেল—এ ধরণের অভিনয় করতে আধুনিকতম কোনো অভিনেতা আজ পর্য্যন্ত সক্ষম হয়েছেন কি? শিশিরকুমারের জীবানন্দ, আলমগীর, রঘুবীর, দিগম্বর,—অহীন্দ্র চৌধুরীর সাজাহান, আবন, সেলুকস্ (এমন কি এই পরিণত বয়সের ডক্টর ভোস, ভোলা মাষ্টার)—নির্ম্মলেন্দুর চন্দ্রশেখরের নবাব, শিবাজী, কংস, সিরাজ,...নরেশ চন্দ্রের কাত্যায়ণ, শাইলক্, ব্যারিষ্টার জিতেন,—ভূমেন রায়ের অ্যান্টিগোণাস্, রডা, কার্ভালো—কত নাম করব?—এই সব চরিত্র রূপায়ণ দেখতে আজ পর্য্যন্ত দর্শক

সমাজের যত আগ্রহ—তেমন আগ্রহ সৃষ্টি আধুনিকতম যুগের কোন শিল্পীর অভিনয়ে সম্ভব হয়নি—রূঢ় হলেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আধুনিক যুগে মঞ্চে যোগ দান করলেও একমাত্র ছবি বিশ্বাস সম্বন্ধে এ অভিযোগ খাটে না। ঋজু, সুঠাম দেহ···এবং সংহত, সুন্দর, নিজস্ব অভিনয় ধারা··· তাঁকে আজ বহু দর্শকের প্রিয় করে তুলেছে। ভাবী কালের মঞ্চ তাঁর কাছে অনেক কিছু দাবী করে।

মঞ্চ জগতের সঙ্গে বর্ত্তমানে যাঁদের যোগ রয়েছে—সেই সব অভিনেত্রীদের বিষয় আলোচনা করতে গেলে সর্ব্বাগ্রে নাম করতে হয় সরযূবালার। যেখানে শিল্পীকে শুধু চরিত্র রূপায়িত করতে হয় না—নিজস্ব সৃষ্টিরও যেখানে অনেকখানি অবকাশ আছে—সেই ধরণের চরিত্রাভিনয়ে সরযূবালা অতুলনীয়া। তাঁর সুস্পষ্ট বাচন ভঙ্গী—যে কোনো প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পক্ষে গৌরবের বিষয়। সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সঙ্গীত মুখর, সকল শ্রেণীর নাট্যাভিনয়ে বিশেষতঃ "ইমোশনাল" (Emotional) চরিত্রাভিনয়ে রাণীবালা অসামান্যা। আভিজাত্য-গর্ব্বিতা আধুনিকার চরিত্রে শান্তি গুপ্তা যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। সর্ব্বরস-পুষ্ট চরিত্রে সুহাসিনীর অভিনয়কেও প্রশংসা করা চলে। মলিনা, সাবিত্রী, পূর্ণিমা এই তিন জন কায়ালোক অপেক্ষা ছায়ালোক-প্রিয়া। মঞ্চে নাম করতে আর বাকী রইলেন—ফিরোজা, বীণা, অপর্ণা, বেলা, বন্দনা, উমা, রাজলক্ষ্মী—ব্যস্ এই পর্য্যন্ত! সে যুগের প্রভা এবং নিভাননী এই দুইটী প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী—যদিও এখনও মঞ্চের সঙ্গে যোগ রেখেছেন—উল্লেখ যোগ্য কোনো ভূমিকায় এঁদের শীঘ্র দেখতে পাওয়া যায় নি। উল্লিখিত অভিনেত্রীদের মধ্যে যে দু' তিন জন অভিনেত্রী শীর্ষ-স্থানীয়া···তাঁরা শিশির, অহীন্দ্র, নির্ম্মলেন্দু, দুর্গাদাস অথবা নরেশ চন্দ্রের শিক্ষায় শিক্ষিতা।

সুতরাং তাঁরাও পুরাতন যুগের। অবশিষ্ট যাঁরা রইলেন, তাঁরা অভিনয় কর্চ্ছেন সত্য; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁদের কাছে স্মরণীয় কিছু পাওয়া যায় নি। মঞ্চের অভিনয় তাঁরা নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছেন, এই টুকুই সান্ত্বনার কথা। তাঁদের মঞ্চ-প্রীতিকে প্রশংসা করি, শ্রদ্ধা করি; কিন্তু তবু বলি,—বাংলার দর্শক তাঁদের মধ্যে অসামান্য প্রতিভার আভাস আজও দেখতে পায় নি।

আধুনিক যুগে মঞ্চ-জগতে শিল্পী তৈরী হ'ল না,—উপযুক্ত শিক্ষার অভাব এর প্রধান কারণ—কেউ কেউ এমন কথা বলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিক্ষার অভাবের চেয়েও এর জন্য ঢের বেশী দায়ী শিক্ষার্থীর নিষ্ঠার অভাব। অসুস্থ দেহ নিয়ে শিশিরকুমার এখনো শিল্পী তৈরী করতে পরিশ্রম করেন। উপযুক্ত শিক্ষার্থী পেলে নির্ম্মলেন্দুও পরিশ্রম করবেন না—একথা বিশ্বাস করতে পারি না। অহীন্দ্র চৌধুরী আজ পর্য্যন্ত নূতনকে তৈরী করতে যে অমানুষিক পরিশ্রম করেন—তা নাট্য-জগৎ সংশ্লিষ্ট কোন শিল্পীর জানতে বাকী নেই। কিন্তু কৈ? তবু শিল্পী তৈরী হচ্ছে কোথায়?

নাট্য-জগতে শিক্ষার চেয়ে বেশী অভাব প্রতিভার, এবং প্রতিভার চেয়ে আরও বেশী অভাব নিষ্ঠার। অনেকে মঞ্চে আসেন আকাশ জোড়া আমিত্বের দম্ভ বা ego নিয়ে: দূতের স্তর থেকেই উল্লম্ফনে রাজ-সিংহাসনে উঠে বসতে চাইবেন। রাজার আকস্মিক অনুপস্থিতিতে দৈবক্রমে এক রাত্রের জন্যও তাঁকে যদি সিংহাসনে বসান হয়—চিরজীবনের মত তিনি কায়েমী সম্রাটত্ব দাবী করবেন। আর কোন দিন দৌত্য-ক্রিয়া তো করবেনই না,—এমন কি সেনাপতির পদে বরণ করলেও হয় তো কার্য্যে ইস্তাফা দিয়ে চলে যাবেন!...বিগত দুই তিন বৎসর

যাবত মাঝে মাঝে আর এক শ্রেণীর শিল্পী মঞ্চে দেখা দিচ্ছেন; তাঁদের সংস্কৃতি, সৌজন্য সকলকে অভিভূত করে। Vanity বা দম্ভ বলে কোনো পদার্থ আমি তাঁদের মধ্যে দেখতে পাইনি। তাঁদের সম্বন্ধে অনেক আশা পোষণ করেছি এবং হয়তো এখনও করি। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে সংশয় জাগে—তাঁরা সকলে মঞ্চকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন না—মঞ্চের প্রতি অপরিসীম আকর্ষণ-বোধ তাঁদের মঞ্চ-লোকে আসবার হেতু নয়। নাটমঞ্চে দাঁড়িয়ে জনসমাদর লাভ করে—প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করে—তাঁরা ছুটে যেতে চান্ চিত্ররাজ্যে। ছায়া-কুঞ্জের দ্রাক্ষাগুচ্ছ নাগালের বাইরে; তাই মঞ্চকে ব্যবহার করেন তাঁরা 'মই'-এর মত। মই-এর সাহায্যে ওপরে উঠে, দ্রাক্ষা-লতা অবলম্বন করে—তারপর মই ছেড়ে দিলে—জানি না শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা কত মধু আস্বাদন করতে পারবেন। তবে, যে সব সত্যি-কারের রসগ্রাহী মঞ্চকে অবলম্বন করে আজও দাঁড়িয়ে আছেন—ছায়া-কুঞ্জের দ্রাক্ষালতা তাঁদের কাছে কিন্তু আপনি নুইয়ে পড়ে···তার প্রমাণ বিরল নয়।···আর এক শ্রেণীর শিল্পীর কথা· ভাবতে দুঃখ হয়। অনেক উদ্যম, অনেক আশা নিয়ে তাঁরা মঞ্চের সেবা করতে আসেন। অতর্কিতে কোথা হ'তে এসে জোটে "শুভার্থী" "গুণমুগ্ধের" দল। তাঁরা দয়া করে শিল্পীকে আত্ম-শক্তিতে অসম্ভব রকম সচেতন ক'রে তোলেন। শিল্পী অমনি আবিষ্কার করেন, মঞ্চ তাঁকে ধারণ করে নি···তিনিই মঞ্চকে ধারণ করে রয়েছেন। আলোর চেয়ে ছায়াকে তখন দীর্ঘতর বোধ হয়; ধ্বনির চেয়ে প্রতি-ধ্বনিকে অনেক বড় বলে মনে হয়। কিন্তু আলো না জ্বললে ছায়া ফেলবে কে? ধ্বনি না জাগলে প্রতিধ্বনি জাগবে কোথা হ'তে? এই সহজ সত্যটি বোঝাতে শিল্পীর আশে পাশে একটী শুভার্থী বা একটী বন্ধুকেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

নাট্যমন্দিরে নাট্য-বেদজ্ঞ পূজারীর অভাব তত পাপ আনে নি—যত পাপ এনেছে—নিষ্ঠাহীন পূজারীর দল। দেবতাকে ব্যঙ্গ করার চেয়ে দেবতার পূজা বন্ধ রাখা অনেক কল্যাণকর। নিষ্প্রদীপ মন্দিরেও হয়তো দেবতা যুগ যুগ প্রতীক্ষায় বসে থাকবেন—কবে নিষ্ঠাবতী পূজারিণী আসবে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে, কবে আসবে নিষ্ঠাবান তরুণ পুরোহিত পুষ্পচন্দনে দেবার্চ্চনা করতে। রঙ্গনাথের মন্দিরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে—সামনে চন্দ্র-তারকা-লুপ্ত আঁধার রাত। এ রাতে কেউ অশ্রদ্ধা নিয়ে, স্বার্থলুব্ধ অশুচি মন নিয়ে এ মন্দিরের পথে পা বাড়িও না। নটরাজের তৃতীয় নেত্র নিমিলিত রয়েছে··· তাকে নিমিলিত থাকতে দাও। পূজারী আসুক,—পূজারিণী আসুক—ভোলা-দেবতা আমাদের সব অপরাধ ভুলে যাবেন তাদের পূজায়। প্রীতি-প্রসন্ন নটরাজের নয়নজ্যোতি সে দিন রাত্রিশেষে নব প্রভাতের সূচনা করবে। আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষা করব ; নটরাজের নব পূজারীর আশা-পথ চেয়ে বলব—স্বাগতম্—স্বাগতম্।

গ্রন্থ-নির্দেশ

নাটক ও নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে যাঁরা আরো বেশী করে জানতে চান—

এই বইগুলি তাঁদের কাজে লাগবে :

Inside the Moscow Art Theatre—O. M. Sayler

The Truth About Voice—Prof. E. Feuchtinger

The English Stage—M. Augustin Filon

Dramatic Opinions and Essays—G. Bernard Shaw

Study and Stage—William Archer

About the Theatre—William Archer

Studies in Stagecraft—Clayton Hamilton

Revolt in the Arts—O. M. Sayler

Towards a New Theatre—E. Gordon Craig

Scene—Edward Gordon Craig

The British and American Drama of Today—Barrett H. Clark

The Theatrical World—William Archer

XXth Century Stage Decoration—W. R. Fuerst & S. J. Hume

The Art of the Theatre—C. Coquelin

Practical Stage Craft for Amateurs—J. B. Thomas

The Art of Make-up—George W. Luft & Co.

The English Stage of Today—Mario Borsa

Plays, Acting, and Music—Arthur Symons

The Continental Drama of Today—B. H. Clark

Play Writing—W. Archer

On the Art of the Theatre—E. G. Craig

A Complete History of the Stage—Charles Dibdin
The Development of Dramatic Art—D. C. Stuart
Players and Playwrights I Have Known—J. Coleman
The New Spirit in Drama and Art—H. Carter
Play-house Impressions—A. B. Walkley
Dramatic Technique—Baker
Acting of the Drama—B. Mathews
How to Produce Amateur plays—B. H. Clark
Play Production for every one—Monica Ewer
Stage Lighting for "Little" Theatres—C. Hardi Ridge
Problem of the Actor—Louis Calvert
The Art of Makeup—Helen Chambers
My Life in Art—C. Stanislavasky
Modern Theatre—Irving Pichal
Drama and Mankind—Halcott Golven
The People's Theatre—Romain Rolland